আচার্য শঙ্কর প্রণোদিত গীতার সম্বন্ধ ভাষ্য

Talkes delivered by Swami Samarpanananda before the students of Indian Spiritual Heritage classes at Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math (2013)
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

গীতা মহাভারতের খুব ছোট্ট একটি অংশ। সপ্তম শতাব্দীতে এসে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশ বছর আগে তখনই আচার্য শঙ্কর দেখলেন গীতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে এত ভাবে গীতার ব্যাখ্যা হচ্ছিল যে সাধারণ মানুষের মধ্যে গীতার ব্যাপারে সংশয় তৈরী হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। একেই গীতা অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র, তার উপর আবার বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা হওয়াতে সাধারণ মানুষের কাছে গীতা আরও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। গীতা যেহেতু সমন্বয় শাস্ত্র সেইহেতু আগে সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নেওয়ার পর গীতা অধ্যয়ন করতে হয়। প্রথমে বেদ পড়তে হবে, বেদের পর উপনিষদ পড়তে হবে। আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে বেদের যে বক্তব্য তার সার উপনিষদে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপনিষদের অনেক মন্ত্রকে উপনিষদের মূল বক্তব্যের সাথে আপাতদৃষ্টিতে মেলান যায় না, আবার অনেক জায়গায় অর্থ স্পষ্ট বোঝা যায় না। এগুলোকে স্পষ্ট করার জন্য লেখা হল ব্রহ্মসূত্র। তাই উপনিষদের পর ব্রহ্মসূত্র পড়তে হয়। ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করার পর গীতা অধ্যয়ন করার যোগ্যতা আসে। এই সব কারণে গীতাকে এত কঠিন শাস্ত্র বলা হয়। একেই এত দুর্বোধ্য তার উপর যাঁরাই একটু আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান অর্জন করে সাধু হয়েছেন তাঁরাই গীতার উপর টীকা, ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। কিন্তু সবাই গীতার অর্থ আর অর্থের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে কারোর বক্তব্যের মধ্যে কোন মিল পাওয়া যায় না। আচার্য শঙ্কর গীতার যে ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে তিনি আগে তাঁর নিজস্ব একটা দর্শন ঠিক করে নিয়েছেন, ঠিক করে নিয়ে তিনি এমন ভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন যে দেখাচ্ছেন গীতারও এই বক্তব্য।

হিন্দু সংস্কৃতির পরম্পরাতে একটা নিয়ম আছে যে, যখনই কোন গ্রন্থ রচনা করা হবে প্রথমেই অন্তত একটা পাতায় বলে দিতে হবে এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য কি। লেখককে আগে বলে দিতে হবে তিনি কি বলতে চাইছেন, পাঠকের যদি পছন্দ হয় তবেই তিনি বাকিটা পড়বেন। আমাদের বেশীর ভাগ লেখাই হল হাতীর লেজের মত। প্রথমেই বিরাট আড়ম্বর করে বক্তব্যকে ফেনাতে থাকবে। ফেনাতে ফেনাতে শেষে ছোট্ট একটা দুটো পাতায় মূল বক্তব্যটা রাখা হবে, তাতে দেখা যাবে বক্তব্যে কোন সারবত্তা নেই। কিন্তু আমাদের ঋষিদের এই ধরণের কোন ব্যাপার ছিল না। ওনারা প্রথমেই মূল বক্তব্যটাকে সংক্ষেপে বলে দিতেন। গ্রন্থের মূল বক্তব্যটা পাঠ করে পাঠকের যদি পছন্দ হয় তবেই সে বাকিটা পড়বে, পছন্দ যদি না হয় তাহলে আর পড়ার দরকার নেই। এই জিনিষটাকেই বলা হয় সম্বন্ধ ভাষ্য বা উপোদ্ঘাত।

আচার্য শঙ্করও গীতার ভাষ্য রচনা করার আগে একটা সম্বন্ধ ভাষ্য দিচ্ছেন, তাতে তিনি প্রথমে বলে দিচ্ছেন গীতার কি বক্তব্য আর তাঁর কি বক্তব্য। একেই গীতা কঠিন, আর এর সম্বন্ধ ভাষ্য আরও কঠিন। তবে আচার্যের এই সম্বন্ধ ভাষ্যকে বুঝে নিয়ে যদি কেউ মাথায় ধরে রাখতে

পারেন তাহলে পুরো ধর্ম জিনিষটা কি, হিন্দুধর্ম কি, গীতা কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি এগুলো তাঁর একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের যত শাস্ত্র আলোচনা করা হয় সবটাই হল এই সম্বন্ধ ভাষ্যেরই ব্যাখ্যা। যেমন স্বামীজী চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যে কটি লেকচার দিয়েছেন, তার মধ্যেই তিনি বেদ-বেদান্তের সারটুকু রেখে দিয়েছেন। দশ খণ্ডে স্বামীজীর যে রচনাবলীর সবটাই হল চিকাগো লেকচারগুলোর ব্যাখ্যা। তাহলে কি চিকাগোর কটি বক্তৃতা পড়ে নিলে দশ খণ্ডে স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ করার দরকার নেই? না, অবশ্যই স্বামীজীর রচনাবলী পুরোটাই পাঠ করতে হবে। কারণ আমাদের পক্ষে ওই লেকচার গুলো ধারণা করা সম্ভব নয়। ধারণা করা সম্ভব নয় বলেই ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু মূল বক্তব্য ওই লেকচারগুলোর মধ্যেই দেওয়া আছে।

অনেক পণ্ডিতদের মুখে গীতা বা অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে মনে হবে খুব যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কিন্তু দেখা যায় ব্যাখ্যা মূল সিদ্ধান্তের সাথে মিলছে না। এগুলোকে বলা হয় অপসিদ্ধান্ত। অপসিদ্ধান্ত মানে হল, ঠাকুর যেমন কথামৃতে বলছেন – আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। এখানে গোয়ালও ঠিক, ঘোড়াও ঠিক কিন্তু গোয়ালে ঘোড়া থাকে না। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে এই গোলমালটা করে ফেলেন। আসলে আচার্য এখানে পরা বিদ্যার আলোচনা করছেন। পরা বিদ্যা হল যে বিদ্যা আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। যে বিদ্যা আমাদের আত্মবিদ্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, সাধনা না থাকলে সেই বিদ্যাকে কখনই বোঝা যাবে না। অপরা বিদ্যা, যেমন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এগুলো একবার পড়ে সব কিছু জেনে নেওয়ার পর দ্বিতীয়বার না পড়লেও চলে, কিন্তু পরা বিদ্যাকে সব সময় অধ্যয়ন করে যেতে হয়। কারণ যে বুদ্ধি দিয়ে অপরা বিদ্যা আয়ত্ত করা হয় সেই বুদ্ধি দিয়ে পরা বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না। ঠিক ঠিক আচার্যের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে সম্বন্ধ ভাষ্যকে আমাদের বার বার পাঠ করে করে এর বক্তব্যকে ভেতরে না বসিয়ে নিলে পরবর্তি কালে আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছের মত সব কিছুতে অপসিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। যাই হোক, আচার্য সম্বন্ধ ভাষ্য শুরু করছেন একটা মন্ত্র দিয়ে। আচার্য নিজে একজন বড় কবি, তাঁর রচিত বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তোত্রই তাঁর কবি প্রতিভার প্রমাণ। এটা খুবই আশ্চর্যের যে, আচার্য পুরানের একটি মন্ত্র দিয়ে গীতার ভাষ্য রচনা শুরু করছেন। পুরানের মন্ত্র দিয়ে শুরু করাতে এটা প্রমাণ করছে, বেদ যা বলছে উপনিষদও তাই বলছে, গীতাও তাই বলে আর পুরানও তাই বলে, সব শাস্ত্র একই কথা বলছে।

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।।

আচার্য এমন একটি মন্ত্রকে নিয়ে এসেছেন যে মন্ত্র দিয়ে পুরো হিন্দুধর্মের দর্শনকে স্পষ্ট করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। গীতাতেই পরে আসবে যেখানে বলা হচ্ছে কোন শুভ কাজ করার আগে ওঁ উচ্চারণ করে কাজ শুরু করতে হয়। ওঁ সব সময় স্বস্তিবাচক। কোন কিছু ব্যবহার করার সময় মনে কোন সংশয় থাকলে ওঁ উচ্চারণ করে দিলে ওই দ্রব্যের সব দোষ কেটে যায়। কোথাও

আবার ওঁ সম্মতি বাচক। হিন্দুদের কাছে ওঁ অত্যন্ত পবিত্র ধ্বণি। এখানে অব্যক্ত মানে প্রকৃতি, প্রকৃতি আবার ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজ আর তমো এই তিনটে গুণকে মিলিয়ে প্রকৃতি। প্রকৃতিকে এখানে যেমন অব্যক্ত বলা হচ্ছে, ঠিক তেমনি অব্যক্ত ছাড়াও প্রকৃতিকে অন্য অনেক নামে সম্বোধিত করা হয়, প্রকৃতিকে কখন বলা হয় মূলা। আবার প্রকৃতিকে কখন ব্যক্তও বলা হয়, কারণ এই প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যাচ্ছে বলে ব্যক্ত বলা হচ্ছে। আবার এই প্রকৃতিকে ঠিক ঠিক জানা যায় না বলে অব্যক্তও বলা হয়। এই জগতে জড় বলতে যা কিছু আছে সবই প্রকৃতি, জড় মানেই প্রকৃতি। প্রকৃতির বাইরে হলেন শুদ্ধ চৈতন্য। যে কোন প্রাণীর দুটো করে সত্তা, একটি তার জড় সত্তা আরেকটি তার চৈতন্য সত্তা। একজন মানুষ চলছে ফিরছে কথা বলছে, সেই মানুষ যখন মারা যায় তখন তার দেহটা জড় পদার্থের মত পড়ে থাকবে। কিন্তু যখন বেঁচে ছিল তখন যে চলছিল, ফিরছিল, কথা বলছিল তখন সেখানে বোঝা যাচ্ছিল যে তার মধ্যে চৈতন্য আছে। প্রত্যেক প্রাণীই হল এই চিৎ আর জড়ের একটা করে গ্রন্থি, শাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে বলা হয় চিজ্জড়গ্রন্থি। আমি হাত নাড়ছি এটাও জড়, এই হাতকে আমার স্নায়ুগুলো নাড়ছে এই স্নায়ুগুলোও জড়, স্নায়ুকে পরিচালিত করছে মস্তিষ্ক সেটাও জড় আর মস্তিষ্ককে মন পরিচালনা করছে, এই মনটাও জড়। হিন্দুদের কাছে মনটাও জড়। আমাদের ঋষিরা জানতেন মন যদি জড় না হয় তাহলে যুক্তিগত অনেক সমস্যা এসে যাবে। বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে এই জায়গাতেই বিবাদ শুরু হয়। বিজ্ঞানের মতে মন হল পুরোপুরি চৈতন্য আর বেদান্ত মনকে চৈতন্য বলে মানবেই না, এই নিয়ে তাঁরা কোন কথাই বলবেন না, তাঁদের কাছে মন পুরোপুরি জড় পদার্থ। মন যদি জড় হয় তাহলে মন অবশ্যই প্রকৃতির এলাকার বস্তু। এই মন দিয়ে আমরা যা কিছুকে গ্রহণ করছি, যখনই ভালো লাগা, খারাপ লাগা, আনন্দ লাগা, দুঃখ লাগা, কষ্ট পাওয়া, সুখ পাওয়া বলছি তার মানে আমি প্রকৃতির এলাকার মধ্যে পড়ে রয়েছি। মা যখন তার সন্তানকে ভালোবাসছে তখন সেটাও যেমন প্রকৃতির এলাকা, আমরা যখন বেদ, গীতা, উপনিষদ অধ্যয়ন করছি সেটাও তখন প্রকৃতির এলাকা।

যিনি ভগবান নারায়ণ তিনি হলেন *পরোঽব্যক্তাদ্* অর্থাৎ তিনি অব্যক্ত মানে প্রকৃতিরও পারে। শুদ্ধ চৈতন্য যিনি, ভগবান যিনি, আত্মা যিনি, চৈতন্য যিনি, তিনি মনের পারে। সব থেকে স্থূল হল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। এই স্থূল জগৎ থেকে আরও সূক্ষ্ম হল ইন্দ্রিয়গুলো, যার দ্বারা এই স্থূল জগৎকে জানা যায়। ইন্দ্রিয় থেকে মন আরও সুক্ষ্ম। কারণ মন ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই মনের এলাকার পারে যিনি আছেন তিনিই ঈশ্বর। এটা কোন তত্ত্ব নয়, এটাই সত্য, এটাই বাস্তব, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে এটাই দেখেছেন। আমার মন যত দূর যেতে পারে, মন যত উচ্চ থেকে উচ্চস্তরের চিন্তা করতে পারে, তারপর একটা উচ্চ অবস্থার পর মন আর কিছু গ্রহণ করতে পারে না, মন খসে পড়ে যায়, সেই অবস্থারও পারে ভগবান নারায়ণ। সেইজন্য এই মন দিয়ে কোন দিন ঈশ্বরকে জানা যাবে না। কেউ যদি বলেন আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব, বুঝতে হবে তিনি কিছুই বোঝেননি। কারণ যখনই বলছে প্রমাণ করে দেব, তার মানে তিনি এখনও মনের এলাকাতেই পড়ে

আছেন, অথচ ভগবান মনের এলাকারও পারে। এই একই কথা উপনিষদও বলছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে– *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*। কোন বস্তুর বর্ণনা করার জন্য আগে মন দিয়ে সেই বস্তুকে ধরে বুদ্ধির বিষয় করতে হবে তারপরেই তাকে বাণী দিয়ে প্রকাশ করা যাবে। তাই বাণী দিয়ে ঈশ্বরকে বর্ণনা করা তো অনেক দূরের কথা, তোমার মন তো সেখানে পৌঁছাতেই পারছে না।

অণ্ডমব্যক্ত সম্ভবম্, অণ্ডম্ মানে এখানে ব্রহ্মাকে, যিনি সৃষ্টির কার্যে ব্যপ্ত তাঁকে বলা হচ্ছে। সেই ব্রহ্মার কোথা থেকে জন্ম হয়; প্রকৃতি থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। খুব সহজ ভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে, সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম রয়েছেন, যাঁকে ঈশ্বর বা ভগবান বলা হয়, যাঁকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যাঁকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছি, এই শুদ্ধ ব্রহ্মই আছেন, এঁর বাইরে আর কিছু নেই। কিন্তু কোন এক কারণে এই শুদ্ধ ব্রহ্মের উপর একটা মায়ার আবরণ পড়ে যায়। যখনই এই মায়ার আবরণ এসে যায় তখন যিনি নির্গুণ নিরাকার তাঁকে সগুণ সাকারের মত দেখাতে শুরু করে। মায়া যদি না থাকে তখন কখনই ঈশ্বরকে দেখা যাবে না, মায়ার বাইরে ঈশ্বরকে বোধে বোধ করতে হবে। কিন্তু সেই ঈশ্বরের কোন গুণ নেই। যেমনি তাঁর নিজের মায়া এই নির্গুণ ঈশ্বরের উপর দিয়ে দেওয়া হয় তখন তাঁকে গুণময় দেখায়। স্বামীজী ঠাকুরের যে আরাত্রিক স্তব রচনা করেছেন, সেখানেও ঠিক এইভাবে তিনি বর্ণনা করছেন – নির্গুণগুণময়। এই যে যিনি নির্গুণ তাঁকেই গুণময় দেখাচ্ছে এটাই তাঁরা মায়া বা তাঁর শক্তি। মায়া বলতে এখানে কোন ম্যাজিকের মত কিছু নয়, মায়া মানে ঈশ্বরের নিজেরই একটা বিশেষ শক্তি। সেইজন্য এই শক্তিকেই বলা হয় বৈষ্ণবী, ভগবান বিষ্ণুর বিশেষ শক্তি। মায়া আর মিথ্যাও এক নয়। লোকেদের একটা ভুল ধারণা হয়ে আছে যে, টাকা-পয়সা, নারী এগুলো মায়া, সব মিথ্যা। কিন্তু এই মায়া মিথ্যা নয়, এটাই ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণের বিশেষ শক্তি। যাই হোক, সেই অব্যক্ত থেকে *অণ্ডম্*এর অর্থাৎ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়।

আমাদের সহজ করে বোঝাবার জন্য ঋষিরা এইভাবে একটা পৌরানিক কল্পনার আশ্রয় নিয়ে বলছেন, প্রথমে একটা বিরাট ডিমের মত থাকে। সেই ডিমটা যখন ভেঙে যায় তখন তার থেকে ব্রহ্মার উদ্ভব হয়। কিন্তু মূল বক্তব্য হল, সেই শুদ্ধ ব্রহ্মের উপর যখন মায়ার আবরণ পরে তখন প্রথম যাঁকে দেখা যায় তিনি হলেন সগুণ ঈশ্বর। সেই সগুণ ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি হয় এই জগতের। আর এই জগতে যিনি প্রথম সৃষ্টি হয়েছেন তিনিই ব্রহ্মা। আর বলছেন, *অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী*, এই অণ্ড থেকেই জাত হয়ে *ইমে লোকা*, যত রকম লোকের আমরা কল্পনা করতে পারি, স্বর্গলোক, পাতাললোক ইত্যাদি সব এই অণ্ড যখন দুটো ভাগে ভেঙে গেল সেখান থেকেই উৎপত্তি হয়েছে। আর কি সৃষ্টি হয়েছে; সপ্তদ্বীপ আর এই মেদিনী মানে পৃথিবী। আমাদের ভারতবর্ষকে তখন জম্বুদ্বীপ বলা হত। জম্বু বলছে কারণ অনেকে মনে করেন এই দেশে অনেক জাম গাছ ছিল বলে জম্বু বলা হয়। কিন্তু দ্বীপ কেন বলা হচ্ছে সেটা কারোর জানা নেই, কারণ আমরা জানি ভারতবর্ষ দ্বীপ নয়। আমাদের দেশকে বলা হয় পেনেনসুলা, মানে যার তিন দিকে সমুদ্র। ভারতবর্ষকে তখন কেন

দ্বীপ বলা হত এটা এখন বলা খুব মুশকিল। আর্কোলজিক্যাল বিভাগের ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন চার লক্ষ বছর আগে হিমালয় সংলগ্ন পুরো এলাকাটা সমুদ্র ছিল, সেইজন্য তখন পুরো ভারতবর্ষকে একটা দ্বীপের মত দেখাত। কোন কারণে উত্তর অংশ ক্রমশঃ ধাক্কা খেতে খেতে ওখান থেকে হিমালয় দাঁড়িয়ে যায়। পুরান আলোচনা করার সময় আমাদের এই ব্যাপারে খুব সাবধান করে দেওয়া হয় যে, পুরানের ভৌগলিক বর্ণনাগুলো খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। তবে যা কিছু দেখছ সবই সেই ঈশ্বর থেকেই জন্ম নিয়েছে। আমি তুমি সবাই যেমন ঈশ্বর থেকে এসেছি তেমনি ভারতবর্ষ দেশটাও সেই ঈশ্বর থেকেই এসেছে আর অন্যান্য যত দেশ আছে সবই ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি হয়েছে এটাই মূল বক্তব্য। সেইজন্য সৃষ্টির ব্যাপারে বা ভৌগলিক বর্ণনার ক্ষেত্রে পৌরানিক কাহিনী গুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নেই। ঋষিরা আগে থেকে জানতেন কিনা বা দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন কিনা যে ভারতবর্ষটা একটা দ্বীপ ছিল, এগুলো নিয়ে বেশী মাথা না ঘামানোই উচিৎ। হয়তো জানতেন বা হয়তো জানতেন না। কিন্তু আমাদের ভালো করে জানা দরকার যে, ঋষিদের কখনই ভূগোল বা ইতিহাসের বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। আচার্য শঙ্করও বার বার বলছেন বেদ-উপনিষদের উদ্দেশ্য কখনই সৃষ্টির বর্ণনা করা নয়। কারণ সৃষ্টির বর্ণনা করাই যদি তাঁদের উদ্দেশ্য থাকত তাহলে একই কথা সব জায়গাতেই বলা হত। সৃষ্টির ব্যাপারে বেদ, উপনিষদ, পুরান, গীতা কোথাও একই কথা বলা নেই। ঋষিরা সৃষ্টির ব্যাপারে, ভৌগলিক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, যাঁরা এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ তাঁরাই এই সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দিতে পারবেন। ঋষিদের এগুলো কাজ ছিল না, তাঁদের কাজ ছিল যতটুকু না বললেই নয় ততটুকু একটু সৃষ্টির কথা বলে দিয়ে তাঁরা যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে দিতেন। ঋষিরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যদের সামনে তুলে দিয়ে তাঁদের সেই দিকে ঠেলে দিতেন। এটুকু জেনে রাখ যা কিছু দেখছ সবই ঈশ্বরের থেকে এসেছে এবার তুমি সেই ঈশ্বরকে কিভাবে জানবে, ঈশ্বরের সঙ্গে কিভাবে এক হবে, তার সাধনা কি, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি।

স ভগবান সৃষ্ট্বেদং জগৎ, তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুঃ মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা, প্রজাপতীন্প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। ততোহন্যাঞ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য, নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণংগ্রাহয়ামাস।

আচার্য পুরান থেকে মন্ত্র দিয়ে গীতার ভাষ্য রচনা শুরু করার পর প্রথম অনুচ্ছেদে যেটা বলছেন, এটাও ভাগবত পুরান থেকে নেওয়া যদিও আচার্য এখানে একটু অন্য ভাবে বলছেন – *স ভগবান*, মানে সেই যিনি নারায়াণ তিনি এই জগৎ বা লোক মানে এখানে ভূঃ, ভূবঃ ও স্ব অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ আর স্বর্গ এই তিনটে লোক সৃষ্টি করলেন। পরের দিকে বলা হয় উপরে সাতটা লোক আর নীচের দিকে সাতটা লোক নিয়ে এই চতুর্দশভুবন। আচার্য ভালো করে জেনে বুঝেই পুরানের একটা মন্ত্র দিয়ে শুরু করেছেন। তার কারণ, যদিও উপনিষদ সৃষ্টিকে অত গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু গীতা জগৎকে একেবারে সত্য বলে মনে করে নিয়ে এগিয়ে গেছে। জগৎ যদি সত্য হয় তাহলে তার

সৃষ্টিটাও পুরোপুরি সত্য হতে বাধ্য। মানুষ যেমন সত্য, মানুষের সমস্যাও ততটাই সত্য। জগৎ যখন সৃষ্টি করা হল এবার এই জগতকে তো সামলাতে হবে! জন্ম দেওয়া খুবই সহজ কিন্তু জন্ম দেওয়ার পর তাকে রক্ষা করে, পালন করে ধরে রাখাটাই কঠিন। ভগবানও দেখলেন জগৎ তো সৃষ্টি হয়ে গেল কিন্তু একে ধরে রাখব কি করে, জগতের স্থিতি কিভাবে করা যেতে পারে! *স্থিতিং চিকীর্ষুঃ* চিকীর্ষু মানে ইচ্ছা করা। পুরান মতে কি বলছে আমরা একটু জেনে নিচ্ছি – পুরান মতে বলে যখন সৃষ্টির সময় হল তখন ভগবান থেকে অণ্ডের জন্ম হল। সেই অণ্ডতে দেখা গেলে – জল, জলের উপরে শেষ নাগ, শেষনাগের উপর ভগবান বিষ্ণু শয়ন করে আছেন। বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে একটা বিশাল পদ্মফুল বেরিয়ে এসেছে। সেই পদ্মফুলের উপর ব্রহ্মা বসে আছেন। ব্রহ্মা হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেলেন তিনি এখানে বসে আছেন। এগুলো সবই কল্পনা, সৃষ্টির রহস্য এত কঠিন আর জটিল যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব, তাই একটা কল্পনার সাহায্য নিয়ে সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাই হোক ব্রহ্মা বুঝতে পারছেন না তিনি কেন এখানে আছেন। ব্রহ্মা বসে বসে ভাবছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন দুটি শব্দ 'ত' আর 'প'। ব্রহ্মা বুঝে নিলেন তাঁকে তপস্যা করতে বলা হচ্ছে। ব্রহ্মা এরপর তপস্যা করতে শুরু করলেন। হাজার বছর তপস্যার করার পর ব্রহ্মার কাছে স্পষ্ট হল কেন তিনি এখানে আছেন। তার মানে তিনি বুঝতে পারলেন আমার এই অস্তিত্ব কিসের নিমিত্তে, আমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি। হাজার বছর তপস্যা করলেন শুধু এটা জানার জন্য যে এই জীবনের অর্থ কি আর উদ্দেশ্য কি। আমরা কি কেউ কোন দিন ভেবে দেখেছি আমি কেন এই জগতে এসেছি আমার এই জীবনের কি উদ্দেশ্য, এই জীবন শেষ হয়ে গেলে আমি আবার কোথায় যাবো; একদিনও কি জীবনকে বিষয় করে আমরা ধ্যান করেছি; একদিনের জন্যও ভাবিনি। যার জন্য আমাদের জীবনটা একটা গতানুগতিক ধারায় চলেছে। ব্রহ্মা কিন্তু হাজার বছর ধ্যান করেছিলেন। যদি জীবনের উদ্দেশ্য কি বুঝতে চাই, জগতে আমি কেন এসেছি জানতে চাইলে ব্রহ্মার মত যতক্ষণ তপস্যা না করা হবে ততদিন জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কারণ এর কোনটাই কোন দিন পরিষ্কার হবে না। ততদিন সবাই যা করে যাচ্ছে আমাকেও তাই করে যেতে হবে। হাওড়া ব্রীজে দাঁড়িয়ে একজন যদি উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন তাকে ঘিরে সব পথ চলতি লোক দাঁড়িয়ে পড়ে উপরে দিকে তাকিয়ে থাকবে। কাউকে জিজ্ঞেস করুন কি দেখছেন, বলবে, জানিনা ওরা দেখছে বলে দেখছি। আপনি স্কুলে কেন পড়ছেন; সবাই পড়ে আমিও তাই পড়ছি। বিয়ে কেন করলেন; সবাই করে আমিও করেছি। একবারও কেউ ভেবে দেখে না কেন আমি এই কাজ করছি। আমাদের কোন চিন্তা নে, ভাবনা নেই। অথচ ব্রহ্মা শুধু জীবনের উদ্দেশ্য জানার জন্য হাজার বছর তপস্যা করলেন। হাজার বছর তপস্যা করার পর তিনি বুঝলেন আমার জীবনের উদ্দেশ্য হল সৃষ্টিকার্যের জন্য। সৃষ্টি কিভাবে করবেন; এর আগের আগের কল্পে যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছে এবারও ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে সৃষ্টি করতে হবে।

ব্রহ্মা এবার সৃষ্টি কার্যে নামলেন। তপস্যার পর ব্রহ্মার অন্তঃকরণ পুরোপুরি সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ থাকাতে তাঁর মন থেকে প্রথম যে চারজন কুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমারের সৃষ্টি হল, এঁদের মনটাও পুরোপুরি সত্ত্বগুণে ভর্তি ছিল। জন্ম থেকেই তাঁদের মধ্যে তীব্র ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপস্যার ভাব। এনারা তাই জন্মেই কমণ্ডলু হাতে নিয়ে তপস্যায় বেরিয়ে চলে গেলেন। ব্রহ্মা তাতে খুব অসন্তুষ্ট হলেন, আমি এত তপস্যা করে এদের সৃষ্টি করলাম আর এরা আমার সৃষ্টি কার্যে কোন সহয়তা না করে বেরিয়ে চলে গেল! আমাদের বিশ্বাস যে এই চার কুমার এখনও তপস্যা করে যাচ্ছেন। ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্যতে এনারা শ্রেষ্ঠতম। তারপর এত দিনে ব্রহ্মার তপস্যার তেজও কমতে শুরু হয়েছে। কারণ ব্রহ্মা তখন কাজে নেমে পড়েছেন। যে কোন সাধু সন্ন্যাসী যখন কাজে কর্মে জড়িয়ে পড়ে তখন সেই সাধুর তেজও কমতে থাকে। স্বামীজীও বলছেন, বিদেশে লেকচার দিয়ে আমার তেজ অনেক কমে গেছে হিমালয়ে ছয় মাস তপস্যা করলে ওই তেজ আবার ফিরে আসবে। ব্রহ্মা এরপর প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলেন। প্রজাপতিদের সৃষ্টি করে বলে দিলেন – দ্যাখো! সৃষ্টি কার্যের জন্যই আমার জন্ম, তোমরাও তাই সৃষ্টি কার্যে নেমে পড়। প্রজাপতিদের নামের তালিকা বিভিন্ন পুরানে বিভিন্ন নাম দেখতে পাওয়া যায়। তবে আচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী প্রজাপতিদের নাম হল, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও বশিষ্ঠ। এই প্রজাপতিদের অনেক জায়গায় আবার সপ্তর্ষিও বলা হয়। আবার অনেক সময় দক্ষ প্রজাপতি, নারদ এনাদের নামও পাওয়া যায়। কিন্তু মোটামুটি এই সাতজনকেই সপ্তর্ষি বা প্রজাপতি বলা হয়। আচার্য যে পুরানকে অবলম্বন করে এই শ্লোকটি লিখেছেন সেখানে হয়তো এইভাবেই দেওয়া হয়েছে।

আচার্য এখানে বলছেন ভগবান নিজেই এনাদের সৃষ্টি করেছেন। ভগবান যখন চাইলেন সৃষ্টি হোক তখন তিনি মরীচি আদি এই সপ্তর্ষিদের সৃষ্টি করলেন। সপ্তর্ষিদের সৃষ্টি করে ভগবান বলে দিলেন তোমরা গৃহস্থ ধর্ম পালন কর। কিভাবে গৃহস্থধর্ম পালন করতে বলছেন? প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দিয়ে। প্রবৃত্তি মানেই হল কাজ করা, কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। যে ধর্মের লক্ষণ কর্ম করা তাকেই বলছেন প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বা প্রবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হিন্দুধর্মের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, গীতা এই ধারণার উপর পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে। এই ধারণাটা বুঝতে না পারলে গীতার ভাবও বোঝা যাবে না। যখনই আমরা কোন ধরণের কার্য করে থাকি তখন সেটাই হয়ে যাবে প্রবৃত্তি। সেই কার্যই যখন ধর্মের জন্য করা হবে তখন সেই ধর্মকে বলা হচ্ছে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। তার মানে আমরা যখন কর্মযোগ করছি তখন সেটা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হয়ে গেল, পূজা-অর্চনা করছি সেটাও প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, সেই রকম সেবাকার্য করা, যজ্ঞ-যাগ করা আর প্রচুর জপ-ধ্যান করা এগুলো সবই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম পালন করলেই যে সব কিছু হয়ে যাবে তা নয়। কিন্তু এখানে প্রজাপতিদের ভগবান প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের শিক্ষা দিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ করে ছুটির দিনে শনি রবিবার যখন সব ভক্তরা ঠাকুরের কাছে আসতেন তখন তাঁদের ঠাকুর এক রকম উপদেশ দিতেন। ভক্তরাও সব মন দিয়ে শুনে খুশি মনে বাড়ি যেতেন,

কেউ ঠাকুরের কথাগুলো নোটও করতেন। আবার নরেন, রাখালাদি কিছু যুবক ভক্তরা যখন আসতেন তখন ঠাকুর এদের ঘরের ভেতরে নিয়ে দেখতেন বাইরে কেউ আছে কিনা, তারপর দরজা জানলা বন্ধ করে অন্য রকম উপদেশ দিতেন। এখানেও ভগবান ঠিক তাই করছেন, *ততঃ অন্যাং* অর্থাৎ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যা গৃহস্থদের জন্য ধর্ম তার থেকে আলাদা আরেক ধরণের ধর্ম আছে। *ততঃ অন্যান্ চ সনকসনন্দনাদীন্ উৎপাদ্য*, সেই অন্য যে ধর্ম তার শিক্ষা দিলেন সনকাদি এই চারজন কুমারদের। এই ধর্মের নাম হল নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। পরবর্তি কালে এই চার কুমারের যারা অনুবর্তি হবে, তারা গৃহস্থধর্ম থেকেও হতে পারে, ভাবীকালের তাদের জন্য চারজন কুমারদের ভগবান নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের শিক্ষাটা দিয়ে রাখলেন।

প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম না হয় বোঝা গেল, যেখানে কাজ করা হয় সেটাই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। তাহলে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে কি কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে চুপচাপ বসে থাকা? কাজ করতে তো কারোরই ভালো লাগে না! কাজ না করে কিভাবে থাকা যায় সেটাই কি ভগবান চারকুমারকে শিক্ষা দিলেন? কখনই না। *নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণম্*, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানেই হল জ্ঞান ও বৈরাগ্য। বৈরাগ্য মানে এখানে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, জগতের কোন কিছুর প্রতি তাঁর আসক্তি নেই, এমনকি নিজের শরীর যে এত প্রিয় সেই শরীরের প্রতিও তাঁর কোন আসক্তি নেই, নিজের চিন্তা ভাবনার প্রতিও কোন আসক্তি নেই। তাহলে কি আছে? জ্ঞান। কিসের জ্ঞান? আত্মজ্ঞান। তিনি পূর্ণ জ্ঞানে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মানে, গীতাতে পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হবে, ঈশ্বর বা আত্মা ছাড়া কিছু নেই এই বোধে প্রতিষ্ঠিত থাকা মানেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকা। এর আগে প্রকৃতি, মায়া, শক্তির কথা বলা হয়েছিল, এগুলোও ঈশ্বরেরই রূপ। মায়ার দরুণ যে সৃষ্টিকে দেখা যাচ্ছে, সেটাও ঈশ্বরেরই রূপ। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। যখন তিনি এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন যে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তখন তিনি কি করবেন? মানুষ কখন কাজ করে? যখন তার মধ্যে অপূর্ণতা থাকে তখন সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্য তাকে কাজ করতে হয়। যিনি দেখে নিয়েছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, আর যিনি নিজেকেও ঈশ্বরের অঙ্গ দেখছেন তখন তাঁর মধ্যে কোথা থেকে অপূর্ণতা আসবে! আমাকে এই জগৎ থেকে কিছু নিতে হবে এই ভাবটা তাঁর ভেতর থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই জগৎ থেকে তাঁর আর পাওয়ার কিছু নেই, হারানরও কিছু নেই। যাঁরা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে আছেন তাঁদের মধ্যে সব সময় এই পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান।

তবে যখনই যারা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম পালন করছে তাদের মধ্যেও নিবৃত্তি লেগেই থাকবে। আমি যখন একটা কাজ করছি, সেই কাজটা হয়ে যাওয়ার পর আমি আরেকটা কাজে হাত দিলাম। এখানে একটা কাজের থেকে নিবৃত্তি হয়ে আরেকটা কাজে প্রবৃত্তি হয়ে গেল। কিন্তু নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের বৈশিষ্ট্যই হল পুরোপুরি নিবৃত্তি, এখানে প্রবৃত্তির কিছুই থাকবে না। কোন কিছুর প্রতি আকাঙ্খা থাকবে না, কোন কাজ করবে না আর মন সর্বদা ঈশ্বরে সংলগ্ন, ঈশ্বর ছাড়া এখানে আর

কিছু নেই। আমি তাহলে বলতে পারি, ঈশ্বরে যে মনটা বসিয়ে রেখেছে সেটাও তো প্রবৃত্তি হয়ে গেল। এখানে এসেই বেদান্ত অন্যান্য ধর্ম থেকে পুরো আলাদা হয়ে যায়। যদি ঈশ্বর আমার বাইরের কোন বস্তু হতেন তাহলে ঈশ্বরে মনকে বসিয়ে রাখাটাও প্রবৃত্তি হবে। কিন্তু আমিই যদি সেই ঈশ্বর হই তখন সেখানে প্রবৃত্তি কি করে হবে! আমি সবার কাছে যেতে পারি, আমার মার কাছে, বাবার কাছে, বন্ধুর কাছে যেতে পারি কিন্তু আমি কি কখন নিজের কাছে যেতে পারি? যে নিজের মধ্যেই আছে, সে নিজের কাছে কি করে যাবে! যার এই বোধ হয়ে গেছে আমি ঈশ্বরতেই আছি, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক তখন সে এই বোধেই অবস্থিত হয়ে যায়। আমাদের মত সাধারণরা মনে করি ঠাকুর মন্দিরে আছেন, তাহলে চল মন্দিরে ঠাকুরের কাছে যাই, তখন এটা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হয়ে গেল। আমাদের পরম্পরাতে দুটি সাধনার কথা বলা হয়, একটা নেতি নেতি, আরেকটি ইতি ইতি। তবে ইতি ইতি সাধনার মধ্যে পড়ে না, নেতি নেতিটাই সাধনার মধ্যে পড়ে। নেতি নেতি মানে বিচার করে করে বলা এটা আত্মা নয়, এটা ঈশ্বর নয়, এটা ব্রহ্ম নয়। যেটা আত্মা নয় তৎক্ষণাৎ সেটাকে ত্যাগ করে দেওয়া। সাধারণ মানুষ সাধনা করার সময় মনে করে আমি এই দেহ, আমি আমার মন, আমার ইন্দ্রিয় আর ঈশ্বর আমার বাইরে আছেন। ঈশ্বরকে ধরে আমার ভেতরে বা সামনে নিয়ে আসতে হবে। এই ধরণের সাধনা সব সময় প্রবৃত্তিলক্ষণ হবে। সন্ন্যাসী জানেন আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার এই শরীর বাইরে থেকে এসেছে, আমার মন বাইরে থেকে এসেছে, আমার স্ত্রী-পুত্র সব বাইরে থেকে এসেছে। যেগুলো বাইরে থেকে এসেছে সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিতে হবে। যারা ভক্ত, যারা কর্মকাণ্ডাদি করছে তারা তাই একটা জিনিষকে পাওয়ার চেষ্টা করে, মানে ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টা করছে। সন্ন্যাসীরা সংসারকে ত্যাগ করার চেষ্টা করে। নেতি নেতি সাধনা হিন্দুধর্ম ছাড়া বিশ্বের আর কোন ধর্মে পাওয়া যাবে না।

আমি আছি এটা তো সত্য। আমি যদি না থাকি তাহলে জগৎ আছে কিনা আমি কি করে জানব! প্রশ্ন হল এই আমিটা কে। যখন আমি মনে করছি আমি শরীর, মন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমার অনেক কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকবে। কিন্তু আমি যখন মনে করছি আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তখন মনে হবে বাকি জিনিষগুলো বাইরে থেকে আমার মধ্যে ঢুকেছে এগুলোকে তাড়াতে হবে। তাড়িয়ে দেওয়া মানে সত্যি সত্যি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া নয়, সব কিছুতে অনাসক্তির ভাব। অনাসক্তির ভাব অবলম্বন করার পরেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে না। এরপরও যত ভেতরে যেতে থাকবে তত দেখা যাবে মনের নানান রকম অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, তখন সেটাকেও ত্যাগ করে দিচ্ছে। সবটাই যদি ত্যাগ করে দেয় তাহলে কি থাকবে? এই জায়গাতেই বেদান্ত আর বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্ম বলবে সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার পর শূন্যই হয়ে যাবে। অনন্ত থেকে অনন্ত বাদ দিলে শূন্য। বেদান্ত বলবে অনন্ত থেকে অনন্ত বাদ দিলে অনন্তই থাকবে। তাহলে তখন কি থাকবে? যা আছে তাই থাকবে। ঈশ্বরই আছেন ঈশ্বরই থাকবেন। ঈশ্বরের উপর যে এত কিছু আরোপ করে রাখা হয়েছে, শীতের সময় আমরা যেমন ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য শরীরে এক

গাদা পোশাক চাপাই। নেতি নেতি যেটা, যাকে নিবৃত্তিলক্ষণ বলছেন এর অর্থ হল এই আরোপিত জিনিষগুলো সব খুলে খুলে ফেলে দেওয়া। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে আমার মধ্যে অভাব বোধ আছে, আমার অভাব আছে বলে স্ত্রী-পুত্রদের জুটিয়েছি, অভাব আছে বলে ঘরবাড়ি জোগাড় করেছি, অভাব আছে তাই এবার ঈশ্বরকেও জোগাড় করতে হবে। তাহলে এগুলো কি ভুল? একেবারেই ভুল নয়। আচার্য শঙ্কর শুধু বলছেন, এই দুটি পথ। কিছু লোকের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল প্রবৃত্তিলক্ষণ। কিন্তু যার প্রবণতা নিবৃত্তিলক্ষণে সে বুঝে গেছে আমার স্বভাবই হল শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, কিন্তু কিছু আবর্জনা ভেতরে ঢুকে গেছে। পেট খালি হলে খিদে পায়, তখন পেট পূরণের জন্য খাবার ভেতরে ঢোকাই। কিন্তু স্নানের সময় শরীরের আবর্জনা জল ঢেলে পরিষ্কার করে দিই। স্নান করা যা সাধনা করা ঠিক তাই। যখন স্নান করি তখন মনে করি জল এনে জলটা গায়ে ঢালছি, কিন্তু না – স্নান করা মানে শরীরের যে গরমটা জমেছিল সেটাকে ঠাণ্ডা করা আর শরীরের যে নোংরা জমেছিল সেগুলোকে বার করা। সাধনা মানে তাই, সংসারের যে আবর্জনা জমেছে সেটাকে সরানো। এই সরানোর জন্য দুটো পথ আছে। একটা হল, এই গ্লাশে যেমন জল আছে, আমি চাইছি গ্লাশে দুধ ঢালব। এখন গ্লাশে দুধ ঢেলে যাচ্ছি, ঢালতে ঢালতে একটা সময় গ্লাশের সব জলটা বেরিয়ে গিয়ে একমাত্র দুধই থাকবে। বোতলে জল ভরার সময় জল ভক্ ভক্ করে ভরছে সাথে সাথে বোতলের ভেতরের বাতাসটা বেরিয়ে গেল – এটাই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে স্নানের উদ্দেশ্য যেমন শরীরের ময়লাটা ত্যাগ করা। একটা হল ভরা আরেকটা হল ত্যাগ করা। নিবৃত্তিলক্ষণে বলছে আমি যা ছিলাম তাই আছি। কিন্তু বাস্তবে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কারণ প্রবৃত্তিলক্ষণে ঠিক ঠিক শেষ কথা ঈশ্বরই আছেন, যা কিছু হয়েছে সব ঈশ্বরই হয়েছেন। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। নিবৃত্তিলক্ষণ যাঁরা পালন করেন তাঁরা দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন। যখন বলছেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন তখন সেই পথকে বলছেন জ্ঞানমার্গ। ভক্ত দেখেন ঈশ্বরই সব হয়েছেন, এটাই প্রবৃত্তিলক্ষণ।

এটা গেল জ্ঞানীর ভেতরের লক্ষণ। বাইরে তাঁর পূর্ণ বৈরাগ্য, জগতের কোন কিছুর প্রতি তাঁর আসক্তি নেই। দক্ষিণেশ্বরে একজন বেদান্তী ছিলেন, যিনি মুখে সব সময় বেদান্তের বড় বড় বুলি আওড়াতেন আর অন্য দিকে লম্পটগিরি করে বেড়াতেন। ঠাকুর তাকে একদিন বলছেন – তুমি একদিকে বলে বেড়াও জগৎ মিথ্যা আর অন্য দিকে এসব কি করে বেড়াচ্ছ? সেই লোকটি বলছে – কেন! জগৎ যখন মিথ্যা তখন এগুলোও তো মিথ্যা। ঠাকুর বলছেন – তোমার এই বেদান্ত জ্ঞানে আমি প্রস্রাব করি। এর অর্থটা কি? তুমি একদিকে বলবে আমি পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত আর যেখানে তোমার বৈরাগ্য দেখানোর কথা সেখানে তুমি বলছ এটা মিথ্যা। আমি তোমাকে পূর্ণ বৈরাগ্যে দেখতে চাই? কিসে পূর্ণ বৈরাগ্য? কামিনী-কাঞ্চনে। যেখানেই দেখা যাবে কামিনী-কাঞ্চনে সামান্যতম আসক্তি আছে তার মানে সেখানে জ্ঞানও শূন্য। একটু দুর্বলতা আছে কিন্তু জ্ঞান আছে, এটা কখনই হয় না। জ্ঞান একটু কম আছে বলা মানে জ্ঞান শূন্য। জ্ঞানের ব্যাপারে হয় পূর্ণ জ্ঞান

আছে তা নাহলে একটুও জ্ঞান নেই। যদি পূর্ণ জ্ঞান থাকে তাহলে একশ ভাগ বৈরাগ্যও থাকবে। যদি পূর্ণ জ্ঞান না থাকে তাহলে বৈরাগ্যের তারতম্য থাকবে, কারোর বেশী বৈরাগ্য থাকতে পারে, কারোর কম বৈরাগ্য থাকতে পারে। যদি বলে আমার বৈরাগ্য মোটামুটি হয়ে গেছে একটু বাকী আছে তার মানে তার জ্ঞান এখনও হয়নি। যাঁর জ্ঞান হবে তাঁর পূর্ণ বৈরাগ্য হবে। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের লক্ষণ হল পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য। এখনও আমি পাঁচ রকম জিনিষের প্রতি ছুটে যাচ্ছি, আমাকে পাঁচটা জিনিষ জানতে হবে, তাহলে বুঝতে হবে আমার এখনও অনেক গোলমাল আছে। তারপরে বলছেন –

দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চং জগতঃ স্থিতি কারণম্। প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চ শ্রেয়োর্থিভির্নুষ্ঠীয়মানঃ। দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেন অধর্মেণ অভিভূয়মানে ধর্মে প্রবর্ধমানে চ অধর্মে, জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ স আদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য চাভিরক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণঃ কিল্ সম্বভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্মঃ, তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদনাম্।

দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চং জগতঃ স্থিতি কারণম্, এই বাক্যটি গীতাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেদে পরিষ্কার দুটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে – প্রথমটি প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর দ্বিতীয়টি নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে কাজকর্ম, ক্রিয়াকর্ম করা। বেদে যে এত রকম যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, নানা রকমের দান, এখন যেমন সেবা কার্যের কথা বলা হচ্ছে এগুলো সবই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। আর দ্বিতীয় যে ধর্মের কথা বলা হয়েছে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, মানে পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ বৈরাগ্য, সে আর গৃহে থাকবে না, ঘুরে বেড়াবে। একটা গৃহস্থের ধর্ম আরেকটি সন্ন্যাসীর ধর্ম। সন্ন্যাসী মানে এখানে শুধু গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের কথা বলা হচ্ছে না, যিনি নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে আছেন তাঁর কোন কিছুর চাহিদা থাকবে না। তিনি পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম কাকে বলে, ধর্মের কি লক্ষণ, আচার্যের মতে ধর্ম হল *জগতঃ স্থিতি কারণম্*। প্রথম লক্ষণ হল জগতের স্থিতির কারণ। ধর্মের কাজ হল জগতের স্থিতি রক্ষা করা। যে ধর্ম অন্য ধর্মের লোকেদের বোমা মেরে খুন করে যাচ্ছে এতে জগতের স্থিতি রক্ষা হচ্ছে না, তার মানে সেই ধর্মকে ধর্ম বলা যায় না। হিন্দুধর্ম দাঁড়িয়ে আছে জগতের স্থিতির কারণের উপর। যদি কোথাও একটু জগতের স্থিতি বিঘ্ন হয় আর সেটা যদি ধর্মের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে সেই ধর্ম কখনই ধর্ম নয়। এটাই হিন্দুদের ধর্মের পরিভাষা। ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণ হল *প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়*, প্রাণী মাত্ররেই উন্নতি। তার মানে পশুপাখি নির্বিচারে হত্যা করে তার মাংস খাওয়ার অনুমতি কখনই হিন্দুধর্ম দেবে না। প্রাণী মানে এখানে সমস্ত রকমের প্রাণীর কথাই বলা হচ্ছে। মেয়ের বিয়ের ভোজে লোক খাওয়ানোর জন্য একশটা মুরগী কেটে, অনেকগুলো ছাগল কেটে তার মাংস খাওয়ানো, এগুলো

আমাদের ধর্ম কখনই অনুমতি দেবে না। আবার একজন লোক অন্য লোকদের পিষে দিনে দিনে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে এটাকেও ধর্ম কখন অনুমতি দেবে না। ধর্মের কাজই হল প্রাণী মাত্রেরই অভ্যুদয় করা। যদি দেখা যায় ধর্ম পালন করে মানুষ আরও গরীব হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে সেই ধর্মে কিছু গোলমাল আছে, তা নাহলে সেই ধর্মকে ধর্ম বলে জানার মধ্যে কোথাও গোলমাল আছে। ধর্ম কখনই কোন ধরণের শোষণ করবে না। যে ধর্ম পালন করে মানুষ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থা থেকে আরও উপরের দিকে উঠে যায়, সেটাই ঠিক ঠিক ধর্ম। ধর্মের তৃতীয় লক্ষণ হল *নিঃশ্রেয়স হেতু*, নিঃশ্রেয়স মানে মুক্তি। সব থেকে যেটা শ্রেষ্ঠ, যেটা শেষ কথা সেটাই নিঃশ্রেয়স। ঠাকুর বার বার বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর দর্শন, এরও মানে সেই নিঃশ্রেয়স। ধর্মের এই তিনটে কাজ। ব্যক্তি স্তরে ধর্ম সমস্ত প্রাণীকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে আর মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে আর সামাজিক স্তরে স্থিতিশীলতা দেবে। এই তিনটে কাজ যদি না হয় তাহলে সেটা কখনই পূর্ণ ধর্ম হবে না। খ্রীশ্চান বা মুসলমানরা হয়তো এটা মানবে না, সেটা অন্য জিনিষ, কিন্তু এদের শাস্ত্রও কিন্তু একই কথা বলছে। মুসলমানদের ধর্মের নাম ইসলাম, ইসলাম শব্দের অর্থ হল শান্তি, শান্তি মানেই জগতে স্থিতি রক্ষা করা। আর বলছে তুমি এই এই কাজ করবে, এই কাজগুলো করলে তোমার ভালো হবে এবং তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লার সাথে মিশে যাওয়া। এখানেও সেই একই কথা বলা হচ্ছে। বাইবেলও একই কথা বলছে, তুমি চার্চে যাচ্ছ, কিন্তু তোমার ভাইয়ের সাথে যদি বিবাদ হয়ে থাকে তাহলে চার্চে যাওয়ার আগে ভাইয়ের সাথে বিবাদটা মিটিয়ে নিয়ে বন্ধুত্ব করে নাও। এটাই জগৎ স্থিতি। যে কোন ধর্মের কাজই হল এই তিনটে – সাংসারিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। এই তিনটে কাজ যদি না হয় বা এর কোন একটা যদি কম হয় তাহলে সেই ধর্মে গোলমাল থাকতে বাধ্য।

বেদ যে কত উচ্চমানের এক দর্শন চিন্তা করা যায় না। বেদের জন্ম আমাদের দেশেই অথচ এখন এই দেশের কি দুরবস্থা! একের পর এক আইন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেশটা দিন দিন দুর্নীতি আর অরাজকতায় ডুবে যাচ্ছে। মানুষ এত উচ্চ ধর্ম পালন করেও দেশের এই হাল কেন হয়েছে, সেটাই আচার্য বলছেন – *দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং*, অনেক দিন ধরে এই ধর্ম পালন করতে করতে ধর্মের মধ্যে একটা গ্লানি জন্মায় এবং ধর্ম নীচের দিকে চলে যায়। কেন এই রকম হয়, *কামোদ্ভবাৎ*, যারা এই ধর্মের পালন করছে তাদের মনের মধ্যে অনেক কামনা বাসনা ঢুকে যায়। কারণ জপ-ধ্যান যদিও করে যাচ্ছে কিন্তু নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়, পূর্ণ জ্ঞান বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। যার জন্য সেবাকার্য যেটা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম তাতে ডুবে আছে। সেবাকাজের জন্য একটা গাড়ির দরকার, কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দরকার, এগুলো জোগাড় করতে গিয়ে নিজের মধ্যেও কামনা-বাসনা জন্ম নিচ্ছে। এগুলো যে কেউ জেনে বুঝে করছে তা নয়, এটা প্রকৃতির নিয়মে হয়ে যায়। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে সব সময় পড়ে থাকলে প্রকৃতির নিয়মে একটা সময়ে কাম বাসনার উদয় হবে। এই ভাবেই অনেক উচ্চ আদর্শ নীচের দিকে নেমে আসে।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলবেন, *স কালেনেহ মহতা যোগ নষ্টঃ পরন্তপ*, আমি তোমাকে যে যোগের কথা বললাম এই যোগ কালের নিয়মে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেক দিন ধরে একটা জিনিষকে যখন অনুশীলন করতে থাকা হয় ধীরে ধীরে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মও অধর্মের দ্বারা চাপা পড়ে যায়। অধর্ম মানেই কাম। কাম মানে এখানে যে কোন ধরণের কামনা-বাসনা। কামনার ধর্ম হল বিবেক ও বিজ্ঞানকে চাপা দিয়ে দেওয়া। অন্য দিক থেকে বলা হয়, সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের উপর একটা মায়ার আবরণ পড়ে যায়। এই মায়ার আবরণকে সংস্কৃতে বলে অবিদ্যা। অবিদ্যা আবার কামনা-বাসনার জন্ম দেয়। অবিদ্যা যেখানে থাকবে সেখানে কামনা-বাসনাও থাকবে, মোদ্দা কথা হল অবিদ্যা মানেই কামনা-বাসনা। কামনা যখন জন্ম নেয় তখন সেখানে অপূর্ণতার ভাব এসে যায়। যার মধ্যে অপূর্ণতার ভাব আসবে সে নিজেকে পূর্ণ করতে চাইবে। নিজেকে পূর্ণ করতে চাইলে তাকে কর্ম করতে হবে। যত কর্ম করতে থাকবে তত অবিদ্যাও বাড়তে থাকবে। যার অবিদ্যা যত বেশী তার কামনা তত বেশী হবে। যত কামনা বেশী হবে তত বেশী বেশী কাজ করবে। যত বেশী কাজ করতে থাকবে তত অবিদ্যাও বাড়তে থাকবে। এটাকেই বলে ভিসাস সাইকেল, এই ভিসাস সাইকেল থেকে কিছুতেই বেড়িয়ে আসা যায় না। আচার্য এটাকেই বলছেন *কামোদ্ভবাৎ হীয়মানবিবেকবিজ্ঞান*, কামের জন্য বিবেক- বিজ্ঞান হীয়মান হয়ে গেল। বিবাক বিজ্ঞান চাপা পড়ে গেলে অজ্ঞান এসে যাবে। অজ্ঞান এসে গেলেই কামনা এসে যাবে, কামনা চরিতার্থ করার জন্য কাজ করতে হবে। কাজ করলে আবার অজ্ঞান এসে যাবে, এইভাবে পর পর চলতেই থাকবে।

সেমেটিক ধর্মে এই অবিদ্যাকেই বলে Original Sin। আদম আর ঈভ ছিল স্বর্গে। ভগবান তাদের স্বর্গের বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। এই ফলটাই হল অজ্ঞান ফল। কিন্তু আদম আর ঈভের মনে হল, একবার খেয়ে দেখিই না কি হয়, যখন অজ্ঞান ফল খেয়ে নিল তখন আদমের প্রথম বোধ হল আমি পুরুষ সে নারী। উপনিষদেও আছে, যখন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ইচ্ছা হল সৃষ্টি করব তখন তার প্রথম বোধ হল *অহম্ অস্মি*, আমি আছি, এই আমি বোধটা এসে গেল। বাইবেলেও বলছে আদমের বোধ হল আমি পুরুষ আর সে নারী। ভগবান যখন আদমের সম্মুখে হাজির হয়েছেন তখন তো তাদের পুরুষ নারী বোধ হয়ে গেছে ভগবানকে দেখেই গাছের পাতা, ছাল দিয়ে নিজেদের শরীরকে আচ্ছাদন করতে চাইল। ভগবান খুব রেগে গেলেন, তোমরা নিশ্চয়ই এই বৃক্ষের ফল খেয়েছ, তোমাদের তো নারী-পুরুষ বোধ হওয়ার কথা নয়। তার মানে যিনি অবিভক্ত, অভেদ তাঁর মধ্যে ভেদ জ্ঞান এসে গেছে। যেখানে পুরুষ-নারীর ভেদ নেই সেখানে কি আছে, যা আছে সেটা মুখে বলা যাবে না। এরপর ভগবান আদম আর ঈভকে স্বর্গ থেকে চ্যুত করে দিলেন। এটাই খ্রীশ্চানদের কাছে আদি পাপ। আমাদের কাছে Original Sin বলে কিছু নেই। ভগবান এদের নিষেধ করেছিলেন এই বৃক্ষের ফল খেতে। ঈশ্বরের আদেশ পালন না করার জন্য তাদের পাপ হয়েছে, সে পাপের জন্য তাদের স্বর্গ থেকে নিষ্কাশিত করে দেওয়া হল। মুসলমানরা আবার বলবে

গফ্‌লা, একটা ভুল হয়ে গেছে। হিন্দুদের কাছে পাপ বলে কিছু নেই, গফ্‌লা বলেও কিছু নেই। হিন্দুরা বলবে অবিদ্যাই সব কিছুর মূলে। অবিদ্যার কাজই হল যেটা আছে সেটাকে ঢাকা দিয়ে অন্য একটা কিছু দেখিয়ে দেওয়া। আর যেটা নেই সেটাকে সামনে নিয়ে আসবে। ম্যজিকেও তো তাই হয়। জাদুকর একটা কলমকে দেখিয়ে ঢাকা দিয়ে দিল, তারপর ঢাকাটা খুলে দিতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল একটা পায়রা। সেইজন্য অনেকে মায়ার সাথে ম্যজিককে এক করে ফেলে। কিন্তু জিনিষটা তা নয়। মায়া মানে অবিদ্যা, সচ্চিদানন্দের মধ্যে অবিদ্যার আবরণ এসে গেছে, যার জন্য তাঁর মধ্যে কাম এসে গেছে। কি কাম? আমি এক, আমি বহু হব। আমি এক, আমি বহু হব – এটাই অজ্ঞান, এটাই অবিদ্যা। এটাকেই মুসলমানরা বলে গাফ্‌লা, খ্রীশ্চানরা বলে Original Sin।

ইচ্ছা মানেই কাম, আমি এক আমি বহু হব এটাই কাম। বহু হতে গেলে সৃষ্টির কাজ করতে হবে, কামনা থেকে কর্ম এসে গেল। এক থেকে বহু হয়ে গেল। বহু হয়ে গেলে এদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হল তেমনি অবিদ্যাও বেড়ে গেল। এরপর গুটিপোকার মত নিজের চারিদিকে অবিদ্যার জাল বুনতেই থাকে, চাইলেও আর সেখান থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারে না।

মানুষের মধ্যে বিবেক-বিজ্ঞান চাপা পড়ে যাওয়া মানেই অধর্মের বৃদ্ধি হওয়া। আর বিবেক-বিজ্ঞান যার জাগ্রত, মানে তার ধর্মটাও জাগ্রত। লড়াই মূলতঃ ধর্ম আর অধর্মের মধ্যে। যদি কেউ প্রশ্ন করে ধর্ম ও অধর্ম কি? এর একটাই উত্তর, বিবেক-বিজ্ঞান জাগ্রত মানেই ধর্ম আর বিবেক-বিজ্ঞান চাপা থাকা মানেই অধর্ম। কখন বিবেক-বিজ্ঞান বেশী থাকে কখন বিবেক-বিজ্ঞান কম থাকে। এখন চারিদিকে তাকালে দেখা যাবে, যে যা পারছে তাই করে যাচ্ছে। তার মানে বিবেক-বিজ্ঞান চাপা পড়ে গেছে, আর তার ফলে অধর্মের জোর বেড়ে গেছে। ভগবান ধর্ম করেছিলেন *জগতঃ স্থিতিকারণম্*। এখন ধর্মটা চাপা পড়ে গেছে আর অধর্মের রমরমা। তাহলে জগতের কি অবস্থা হবে? জগতের স্থিতি নষ্ট হয়ে অনবস্থায় চলে যাবে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন একটা পিওন থেকে শুরু করে উপর মহল পর্যন্ত সবাই ঘুষ নিচ্ছে, সবাই চুরি করছে। ঠাকুর বলছেন সাধু কামিনী-কাঞ্চন থেকে সব সময় দূরে থাকবে। সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখে গৃহস্থ এক আনা ত্যাগ করতে সাহস পাবে। কিন্তু এখন বাবাজীদের কাছে কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া আর কিছু নেই। যাঁর কাজ হল ধর্মের রক্ষা করা, সেই রক্ষকই এখন কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে। ধর্মটা একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

ধর্মের এই অবস্থা হলে ভগবান তখন কি করেন? *স আদিকর্তা*, সেই আদিকর্তা যিনি তিনি তখন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ হন। আদিকর্তা কে? আদিকর্তা ব্রহ্মা নন, ব্রহ্মার পেছনে যিনি প্রকৃতি তিনিও আদিকর্তা নন। আদিকর্তা হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর থেকেই সৃষ্টি হয়। এই আদিকর্তা যিনি তাঁর একটি নাম নারায়ণ। আদিকর্তার যে কোন নাম হতে পারে, আল্লা তাঁরই নাম, গড্ তাঁরই নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই নাম। এই রকম তাঁর আরেকটি নাম নারায়ণ বা বিষ্ণু, *নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুঃ*

যিনি বিষ্ণু তাঁরই একটা নাম নারায়ণ। নার মানে জল, যিনি জলে বাস করেন। ভগবান আদি জল, যেটাকে কারণ সলিল বলা হয়, সেই কারণ সলিলের উপর শয়ন করে আছেন বলে তাঁর নাম নারায়ণ। নারায়ণ শব্দের আরেকটা অর্থ হতে পারে, *নরঃ অয়ন,* অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আয়ন মানে অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করে আছেন বলে তাঁর নাম নারায়ণ। নারায়ণ একটা generic নাম বিশেষ, যেমন গড় একটা generic নাম, অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে নারায়ণ নাম। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট একটা নাম হবে তখন তাঁকে বিষ্ণু বলবে। বিষ্ণু নামটা ভগবানের specific নাম। ঈশ্বর হল ব্যাপক অর্থে আর শ্রীরামকৃষ্ণ হল বিশেষ নাম, যদিও ঈশ্বর আর শ্রীরামকৃষ্ণ বা নারায়ণ আর বিষ্ণুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু মুসলমানরা শ্রীরামকৃষ্ণকে আল্লা বা ঈশ্বর বলবে না। সংস্কৃতে যত শব্দ আছে সব শব্দেরই একটা ধাতু থাকবে। বিষ্ণু শব্দের ধাতু হল বিষ্, বিষ্ মানে সব কিছু আচ্ছাদন করা, যিনি পুরোটাই ছেয়ে আছেন। বিষ্ণু মানে যিনি সব কিছুকে আচ্ছাদন করে আছেন। ঈশ্বর মানেও তাই, ঈশ্ ধাতু থেকে ঈশ্বর শব্দ এসেছে। ঈশ্ মানে শাসন করা। যিনি সবাইকে শাসন করেন তিনি হলেন ঈশ্বর। আবার অনেক জায়গায় বলে বিষ্ মানে ভেতরে ঢুকে যাওয়া। অন্তর্যামী রূপে ভগবান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ঢুকে আছেন বলে তাঁর নাম বিষ্ণু। আবার যখন ঈশ্বর রূপে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মের মধ্যে চালনা করছেন তখন সেই ঈশ্বরকেই বলছেন বিষ্ণু। ঈশ্বরের এটাই খুব বিচিত্র বৈশিষ্ট্য, আমার আপনার সবার এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অন্তর্যামী রূপে চালনা করছেন তিনিও ঈশ্বর আবার বাইরেও যিনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালনা করছেন তিনিও ঈশ্বর, দুটো সেই একই ঈশ্বর। এই জায়গাতে এসে অন্যান্য মতের সাথে বিরোধ লাগে। খ্রীশ্চান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদীরা কখনই এটা মানবে না যে, যিনি ভগবান তিনিই আমাদের ভেতরে অন্তর্যামী রূপে আছেন। অন্তর্যামীর রূপে যিনি ভগবান আর বাইরে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন এঁরা দুজন যে সেই একই ভগবান এই মতকে তারা মানবে না। তারা বলবে পূর্ণ আর অংশ। ঈশ্বর যিনি তিনি পূর্ণ আর আমার আপনার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী তিনি অংশ।

যিনি নারায়ণ, যিনি ঈশ্বর, অর্থাৎ যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছিল এবং তাঁর উপর যে মায়ার আবরণ এসে গিয়েছিল তখন তিনিই হলেন ঈশ্বর। ব্রহ্মের উপর মায়ার আবরণ যখন এসে যায় তখন তাঁকেই বলা হয় ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরকে বলা হয় নারায়ণ, সেই নারায়ণেরই একটা নাম বিষ্ণু। এখানে আচার্য বলছেন যিনি বিষ্ণু তিনি অবতারত্ব গ্রহণ করেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই মালিক, তিনি এবার অবতার হলেন। কেন অবতার হলেন? ধর্মটা চাপা পড়ে গিয়েছিল, ধর্ম চাপা পড়া মানে বিবেক-বিজ্ঞান চাপা পড়ে যাওয়া। তার মানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সব বেড়ে গেছে। তাই অধর্মও বেড়ে গেছে। এই জিনিষটাকেই পরে আচার্য মূল গীতার ভাষ্যে যেখানে *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত* বলা হবে সেখানে আরও বিস্তৃত ভাবে বলবেন। ধর্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্তিলক্ষণ আর নিবৃত্তিলক্ষণ। নিবৃত্তিলক্ষণের মূল হল জ্ঞান আর বৈরাগ্য। এই জ্ঞান বৈরাগ্য যখন দমে যায় তখন কাম-ক্রোধ-লোভাদি বেড়ে যায়, তার সাথে অধর্ম মাথা তুলে দাঁড়িয় সবার উপরে

ছড়ি ঘোরায়। অধর্মের এই বাড় বাড়ন্ত ডানাটাকে কেটে সব কিছু আবার ঠিক করতে ভগবানকে অবতার হয়ে আসতে হয়। তিনি এসে কি করবেন; যার জন্য অধর্মটা বড্ড বেশী চাড়া দিয়েছে হয় তার মাথাটা কেটে উড়িয়ে দেবেন, যেমন শ্রীরামচন্দ্র রাবণের মাথা কেটে দিলেন। আর যখন সেই রকম কেউ না থাকে যাকে শেষ করতে হবে, তখন তিনি সবাইকে একটা পথ দেখিয়ে দেবেন। যেমন ঠাকুর, তিনি কারোর নাশ করলেন না, কিন্তু নিজে সাধনা করে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন জীবন এইভাবেই চালাতে হবে। কপিল মুনি, দত্তাত্রেয় এনারাও তাই করেছিলেন, তাঁরাও একটা সাধনা করে দেখিয়ে দিলেন এই যুগে এটাই পথ। অবতাররা যখন আসেন তখন তাঁরা দুই রকমের আসেন। প্রথমটায় তাঁরা যে জায়গাটা অধর্মের উৎস সেটাকেই শেকড় শুদ্ধু উপড়ে শেষ করে দেন। আর দ্বিতীয় সেই রকম কোন specific উৎস না থাকলেও চারিদিকে অরাজকতা, অধর্ম ছড়িয়ে আছে তখন তিনি সেই অধর্মের মাঝখানে এসে বিরাট একটা তপস্যা করে সাধারণ লোকের সামনে আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়ে দেন এটাই পথ। যখন তপস্যা দিয়ে আদর্শ স্থাপন করেন তখন তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ বেশী থাকে। আর যখন তিনি অধর্মের উৎসকে নাশ করতে নেমে পড়েন তখন তাঁকে রজোগুণ ও তমোগুণ অবলম্বন করতে হয়। কূর্মাবতারে যেমন তাঁকে তমোগুণের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, নৃসিংহ অবতারে তিনি শক্তির তমোগুণের আশ্রয় নিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপুকে নাশ করার জন্য। আবার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তিনি রজোগুণ অবলম্বন করেছিলেন। সেই ভগবানই আবার যখন কপিল মুনি, শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে এসেছিলেন তখন একেবারে শুদ্ধসত্ত্বগুণে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন।

তিনি যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি বিষ্ণুর অংশ থেকে আসেন। এটা ভাগবতের একটা মত। আচার্য সব শাস্ত্রই জানতেন বলে তিনি এখানে ভাগবতের এই মতটা দিয়ে দিলেন। ভাগবতের মতে অবতারের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে, যেমন অংশ অবতার, কলা অবতার আর পূর্ণ অবতার। ঠাকুরও মাঝে মাঝে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের জিজ্ঞেস করতেন – আমাকে তোমার কি মনে হয় অংশ না কলা। কলা মানে, চন্দ্রের যেমন ষোলটি কলা হয়, ষোল কলার এক কলা, দুই কলা এই রকম করে ভগবান বিষ্ণু অবতার হয়ে আসেন। আর অংশ মানে ছোট বড় যে কোন অংশ হতে পারে, নিরানব্বুই শতাংশ হলেও অংশ আর একটু হলেও অংশ। অংশ মানে কোথাও কম আবার কোথাও বেশী হতে পারে। এগুলোকে খুব একটা আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই, এগুলো শব্দের খেলা মাত্র। এখানে আচার্য বলছেন *দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন*, দেবকী আর বসুদেবের গৃহে বিষ্ণুর অংশে জন্ম নিলেন।

ঠাকুর কথামৃতে অনেক জায়গায় বলছেন – এঁর (ঠাকুরের) ভেতরে দুজন আছেন, একজন হলেন তিনি আরেকজন হল ভক্ত। আমরা যখন বলি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, তখন আমরা ঠিকই বলি, ভুল কিছু বলছি না। কিন্তু বুঝতে গেলে এটাকে অন্য ভাবে বলে বুঝতে হয়। তখন বলতে হয় যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনিই

শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন। দুটো কথার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ভগবান হন তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হল, শ্রীরামকৃষ্ণ মারা গেলেন। তাহলে যে ভগবানের জন্ম হয় মৃত্যু হয় সেই ভগবান কিসের ভগবান! তাই বলতে হয়, যিনি ভগবান তিনি ওই দেহকে আশ্রয় করে লীলা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহলে কে? তিনি দেবকী আর বসুদেবের সন্তান। তাহলে ওই দেহের মধ্যে কে আছেন? তাঁর দেহের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু আছেন। ভগবান বিষ্ণু যদি ওই দেহের মধ্যে থাকেন তাহলে বাকি জায়গায় কি আছে? আর ভগবান যিনি তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে ঢুকে যান তাহলে ভগবানের জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাবে, তখন তো জগতে গোলমাল লেগে যাবে। তাই বলছেন *অংশেন*, ভগবান একসাথে হাজার জায়গায় থাকতে পারেন। আগে এগুলো ভালো উপমা দিয়ে বোঝান যেত না, কিন্তু এখন ই-মেলের যুগে এটা ভালো বোঝান যায়। তোমার কাছে একটা ই-মেল এসেছে। সেই ই-মেলটা তোমার মেল আইডিতে রেখে দিয়ে তার দশটা কপি করে দশ জায়গায় পাঠিয়ে দিলে। এগুলো উপমা মাত্র। আমাদের সমস্যা হয় আমরা ভগবানের ব্যাপারে যখন একটা কিছু ধারণা বা বোঝার চেষ্টা করি তখন তা অতি সাধারণ লোকের মতই বোঝার চেষ্টা করি। ভগবানকেও আমরা নিজেদের মত সাধারণ মনে করি। কিন্তু তা নয়, গীতাতে পরে আসবে যেখানে ভগবান বলবেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং* আমার জন্মটাও দিব্য আমার কর্মটাও দিব্য। দিব্য মানে এখানে মানুষের কোন ব্যাপার নেই, মানুষের ব্যাপারে হলে সব গোলমাল পাকিয়ে যাবে। এই কারণেই গীতাকে এত কঠিন শাস্ত্র বলা হয়। জিনিষটা দিব্য কিন্তু আমরা সেটাকে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি বলেই আমাদের বুঝতে এত সমস্যা হয়ে যায়।

ভগবান নারায়ণ তিনি তাঁর অংশে দেবকী আর বসুদেবের সন্তান রূপে আবির্ভূত হলেন। কেন তিনি অবতার হয়ে আবির্ভূত হলেন? বলছেন *ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য চাভিরক্ষণার্থং* ভৌমস্য মানে এই পৃথিবীতে, শুধু একটা অঞ্চলের জন্য নয়, শুধু মথুরা বৃন্দাবনের জন্য নয়, সারা বিশ্বের যত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁদের ব্রাহ্মণত্বকে রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ হন। যদিও পুরানে বলা হয় শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতা যুগের অবতার, শ্রীরামচন্দ্র দ্বাপর যুগের অবতার ইত্যাদি, কিন্তু আসলে অবতার অবতীর্ণ হওয়া মানে সত্যযুগ। স্বামীজী বলছেন যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন সেদিন থেকে সত্যযুগ শুরু হয়েছে। সত্যযুগ যদি না হয় তাহলে আচার্যের ভাষ্য মিথ্যা হয়ে যাবে। সত্যযুগ মানেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা। এখানে ব্রাহ্মণ মানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বর্ণের কথা বলছেন না। অবতারের একটাই কাজ যেটা আচার্য বলছেন, ভৌমস্য, সারা বিশ্বে যে ব্রাহ্মণ আছে তার ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা। ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য কি? ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য একটি জ্ঞান আর বৈরাগ্য। যে ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্ঞান নেই বৈরাগ্য নেই সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণকে নিয়ে বলা হচ্ছে না। এখানে বলছেন না যে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য, বলছেন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের রক্ষা। ব্রাহ্মণত্বের রক্ষা মানেই সত্যযুগ। ব্রাহ্মণত্বের রক্ষা মানেই জ্ঞান বৈরাগ্যের রক্ষা। ঠাকুর বলছেন – যদি দেখি পণ্ডিতের মধ্যে বিবেক বৈরাগ্য আছে তখন তার কথা শুনি। আর যদি না থাকে, শকুন তো অনেক উপরে ওঠে কিন্তু নজর

ভাগাড়ের দিকে। যে পণ্ডিতের মন কামিনী-কাঞ্চনে পড়ে আছে, কামিনী-কাঞ্চনে মন পড়ে থাকা মানেই ভাগাড়ের দিকে নজর, সেই পণ্ডিত আর কিসের পণ্ডিত! ভগবানের একটাই কাজ, ধর্ম সংস্থাপন করা। ধর্ম সংস্থাপন কিভাবে করবেন? ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার দ্বারা। একজন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব কি? একজন ক্ষত্রিয় যখন কাউকে অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি তখন ব্রাহ্মণের কাজই করছেন। একজন বৈশ্যের ব্রাহ্মণত্ব কি? ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্ম শেখান। ইণ্ডিয়ান ইনস্ট্যুটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে যাঁরা অধ্যাপনা করছেন তাঁরা বৈশ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ। আর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব শুধু জ্ঞান আর বৈরাগ্য।

গীতা শাস্ত্রে কিভাবে ভগবানের অবতীর্ণ হওয়া দেখান হয়েছে? ভগবান নারায়ণ যাঁর নাম বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুর অংশ থেকে *কৃষ্ণঃ কিল্ সম্বভূবঃ*। আচার্যের এটাই বিশেষত্ব, শ্রীকৃষ্ণের যে জন্ম, তাঁর যে লীলা এগুলোকে আচার্য একেবারে খাঁটি সত্য বলে নিচ্ছেন না। বলছেন *কিল্ সম্বভূবঃ*, কিল্ মানে লোকমুখে শোনা যায় দেবকী আর বসুদেবের বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কে? বিষ্ণুর অংশে তিনি অবতার হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে *কিল্ সম্বভূবঃ* বলা হবে? না, কারণ আমরা জানি তিনি কামারপুকুরে জন্ম নিয়েছিলেন, এই ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ কিছু নেই। সেইজন্য আচার্য বলছেন এই রকম শোনা যায়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। আচার্যের মূল বক্তব্য গীতার দর্শন, কিন্তু গীতার দর্শন দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ কে জানতে ইচ্ছে হওহাটা স্বাভাবিক। আচার্য তাই বলে দিলেন তিনি দেবকী ও বসুদেবের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণের বিশেষত্ব কোথায়? ভগবানের বিশেষ শক্তি তাঁর মধ্যে কাজ করছে। কিসের জন্য কাজ করেছেন? ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য। এইটাই অবতারতত্ত্বের সারাংশ যেটা আচার্য তাঁর ভাষ্যে রেখে দিলেন।

আচার্য একদিকে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ রূপে বলছেন, আবার বলছেন তিনি ভগবান বিষ্ণুর অংশে অবতার আর তার সাথে বলছেন শ্রীকৃষ্ণের কি কাজ – ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা। সারা জীবন যিনি হাজার হাজার মিথ্যা কথা বলে গেলেন, চালাকি, ছল-চাতুরি করে গেলেন, কত লোককে হত্যা করলেন, করালেন, মারও খেয়ে গেলেন, গোপীদের সঙ্গে লীলা করে গেলেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন, যার জন্য তাঁর নাম হল রণছোড়, তাঁর নামে আচার্য বলছেন শ্রীকৃষ্ণের কাজ হল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা। এই কথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা বলছেন না, যিনি গোঁড়া যুক্তিবাদী তিনি বলছেন, সারা বিশ্বের ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আগমন। এই আপাত বিরোধী বক্তব্যকে যেদিন কেউ মিলিয়ে দিতে পারবেন সেদিন তাঁর কাছে অবতার তত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তারপরেই আবার বলছেন *ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যৎ বৈদিকো ধর্মঃ*, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বকে যদি রক্ষা করা হয় তাহলেই বেদের যে দুটি ধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ আর নিবৃত্তিলক্ষণ, এই দুটি ধর্ম রক্ষা পেয়ে যাবে। ব্রাহ্মণরা যদি সব কিছু গোলমাল পাকিয়ে দেয় তাহলে এই দুটি ধর্মই

বিনাশ হয়ে যাবে। তাহলে আজকে আমাদের দেশের কেন এই দুরবস্থা; ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থ এক আনা ত্যাগ করার সাহস পাবে। গৃহস্থ কে; ব্রাহ্মণ। সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে ব্রাহ্মণ এক আনা ত্যাগ করতে সাহস পাবে। আর ব্রাহ্মণের ষোল আনা ত্যাগ দেখে গৃহস্থরা এক আনা ত্যাগ করবে। ঠাকুর অবশ্য এইভাবে বলেননি, ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হচ্ছে। ব্রাহ্মণরাই সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ এখন টাকা রোজগারের পেছনে দৌড়াচ্ছে, যে কোন মন্দিরে গেলে দেখা যাবে পুরোহিতরা কোথাও কাঙালের মত হাত পাতছে, আবার কোথাও ঘাড় ধরে মস্তানি করে তীর্থযাত্রীদের থেকে লুটেপুটে নিচ্ছে। সেই ত্যাগ তপস্যা ব্রাহ্মণের থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীদের কাছে যাচ্ছে সেখানেও এখন বৈভব আর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। গৃহস্থরা এখন কোথা থেকে সেই শক্তি আর সম্বল পাবে! তার ফলে ব্রাহ্মণত্ব এখন নষ্ট হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করতে হলে আগে তাকে সেই জ্ঞান দিতে হবে, তারপর তাকে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে হবে, ব্রাহ্মণের খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন যদি ব্রাহ্মণ সংস্কৃত পড়ে, বেদ পড়ে তাহলে তাকে না খেয়ে মরতে হবে, তার থেকে যাও বিজ্ঞান নিয়ে পড়, ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়। তাই এই এখন ব্রাহ্মণত্ব শেষ হয়ে গেছে, ব্রাহ্মণত্ব শেষ মানে ধর্মও শেষ। আর ধর্ম শেষ মানেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্যের বৃদ্ধি হয়ে অধর্ম বেড়ে যাবে, বিবেক বৈরাগ্য শেষ হয়ে যাবে। যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ জ্ঞান আর বৈরাগ্য ঠিক থাকে তখনই সমাজ ঠিক থাকে।

আর বলছেন *তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদনাম্*, বর্ণাশ্রমের ভেদ যদি না থাকে ধর্ম তাহলে কখনই দাঁড়াতে পারবে না। এই ব্যাপারে আচার্য একেবারে দৃঢ় ছিলেন। আজ সবাই চিৎকার করছে জাতিপ্রথা তুলে দাও, সমস্ত ভেদাভেদ ভেঙে দাও। কিন্তু আমরা একবারও এর পরিণাম ভেবে দেখছি না। আমাদের ঋষি মুনিরা দুম্ দাম্ করে কিছু আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে যাননি, তাঁরা আমাদের সমাজের সুরক্ষার জন্য এই জাতিপ্রথা, বর্ণাশ্রমের বিধান দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আর যেমন কেউ বাণপ্রস্থ পালন করছে না। কিন্তু আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র পরিষ্কার বলে দিচ্ছে নাতির মুখ দেখে নিয়েছ, এবার তুমি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়। পারলে তোমার স্ত্রীকে নিয়েও বেরিয়ে যাও, স্ত্রী যদি যেতে রাজী না হয় তাহলে তার থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে তুমি নিজে একাই বেরিয়ে যাও। যতক্ষণ না কিছু মানুষকে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে একেবারে উৎসর্গ করে না দেওয়া হয়, তাকে বলে দিতে হয় তোমার জন্মই হয়েছে জ্ঞানার্জনের জন্য, এছাড়া তোমার আর কোন গতি নেই, ততক্ষণ সমাজ দাঁড়াতে পারবে না, সমাজ পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। আজকে ভারতের যে দুর্গতি তার মূলে একটাই কারণ, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের সমস্যা হল আমাদের যে বর্তমান সমাজ, এখন যে দিনকাল পড়েছে, এখানে পুরনো দিনের বর্ণাশ্রম প্রথা অনুপযুক্ত। বর্ণাশ্রম প্রথাটা বেদের জিনিষ নয়, এটা স্মৃতির জিনিষ। আর সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে নতুন করে স্মৃতি রচনা করতে হয়। স্বামীজী বর্ণাশ্রমের যেটাকে নিন্দা করেছেন তা হল, সমাজের উপরতলার

লোকরা সুখ সুবিধা ভোগ করবে আর যারা নীচে পড়ে আছে তাদের উপর অমানবিক শোষণ করে যাবে এটা কখনই বরদাস্ত করা যায় না। সেইজন্য জাতিপ্রথাকে নতুন আকারে যুগোপযোগী করার খুব প্রয়োজন। জাতিপ্রথার পুরনো আকার এখন ভারতে আর নেই, আর কোন দিন আসবেও না। স্বামীজীও বলছেন ভারত থেকে এই পুরনো জাতিপ্রথা যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় তত মঙ্গল। কিন্তু তার সাথে সাথে যতক্ষণ একটা committed band না আসছে যেমন সন্ন্যাসীরা এঁরা আধ্যাত্মিকতাতে committed band। শাস্ত্রজ্ঞান সন্ন্যাসীরা যেভাবে ধরে রেখেছেন সন্ন্যাসীর বাইরে কোন দিন কেউ তা ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু পরবর্তি কালে কেউ যদি সন্ন্যাসী না হয় তাহলে এই শাস্ত্রজ্ঞানকে কে ধরে রাখবে? সন্ন্যাসীরা তো আর বিয়ে করে সন্তান উৎপত্তি করে সন্ন্যাসী তৈরী করতে পারবে না। এই কারণে ওনারা ব্রাহ্মণদের সমাজে ধরে রেখেছিলেন, ব্রাহ্মণদের বলে দেওয়া হল তুমি বিয়ে থা করে পবিত্র জীবন যাপন কর, পবিত্র ভাবে সন্তান উৎপত্তি কর, আর তোমার সন্তানকেও জ্ঞান বৈরাগ্যের অনুশীলনে রপ্ত করে দাও। তার জন্য হয়তো তুমি না খেয়ে মরবে, তোমার সন্তানও হয়তো না খেয়ে মরবে কিন্তু সম্মান তোমাকে সবার থেকে বেশী দেওয়া হবে। এই সম্মানের বদলে তুমি শুধু এই সনাতন বিদ্যাটাকে ধরে রাখ। এই সনাতন অধ্যাত্ম বিদ্যা যদি না থাকে আমাদের সমাজ শেষ হয়ে যাবে। জগতের স্থিতির জন্য ধর্ম, ধর্ম মানেই জ্ঞান বৈরাগ্য, অধর্ম মানে কাম ক্রোধাদি। এটা সব সময় বজায় থাকবে যখন বর্ণাশ্রম ঠিক থাকবে। বর্ণাশ্রম ঠিক থাকলে ব্রাহ্মণরাও ঠিক থাকবে। যখনই ভগবান অবতার রূপে আসেন তখনই তিনি ব্রাহ্মণদের ঠিক করে দেন। ব্রাহ্মণরা ঠিক থাকলে বাকিরাও সব ঠিক থাকবে, সমাজে স্থিতিশীলতা আসবে, মানুষের জীবনে সচ্ছলতা আসবে, তাদের টাকা-পয়সা হবে আর মানুষ নিজের মত মুক্তির পথে এগিয়ে যাবে। এটাই অবতারের কাজ, এই কাজের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন। এরপরে বলছেন ভগবান কে? আর তিনি কেন আসেন?

স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য, অজোহব্যয়ো ভূতানাং ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবোহপি সন্, স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়ং অর্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, গুণাধিকৈর্হি গৃহিতোহনুষ্ঠিয়মানশ্চ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

এই অনুচ্ছেদটিতে ভগবানের সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুধর্মকে আচার্য শঙ্কর যে ভাবে বুঝেছিলেন এবং এই ধর্মের সব কিছুকে যেভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, এই রকম পেছনের দিকে আমরা এক ব্যাসদেবকে পাই আর পুরানে শ্রীকৃষ্ণকে পাই আর আমাদের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দকে পাচ্ছি। মোটামুটি এই তিন চারজনকে অধ্যয়ন করলেই পুরো হিন্দুধর্মকে জানা হয়ে যাবে। প্রথমের দিকে ব্যাসদেব, ব্যাসদেবকে পড়লে শ্রীকৃষ্ণকেও পড়া হয়ে যাবে, তারপর

আচার্য শঙ্কর। আর বর্তমান কালে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পড়লে ধর্মের সার জানা যায়। ঠাকুর আর বিবেকানন্দ এই দুজনকে এক সঙ্গেই পড়তে হবে বা যদি পুরোটাই পড়তে হয়ে তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী পড়লেই হবে, কারণ ঠাকুরের কথাগুলো স্বামীজীর মধ্যে সমাহিত রয়েছে। আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরের খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন, এত সুন্দর প্রাঞ্জল সংজ্ঞা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে বলছেন *স চ ভগবান্*, সেই ভগবান কে, যাঁর মধ্যে ছয়টি ঐশ্বর্য রয়েছে। এই ছয়টি ঐশ্বর্য কি, *জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ* জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ। পুরান এবং কোথাও কোথাও শাস্ত্রে এই ছয়টিকে অন্য ভাবে বলা হয়েছে, কোথাও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে কিন্তু আচার্য শঙ্কর তাঁর নিজের মত ব্যাখ্যা করে গেছেন। এই ছয়টি ঐশ্বর্য ভগবানের মধ্যে *সদা সম্পন্নঃ* এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য, এই ছয়টি ঐশ্বর্য সব সময় ভগবানের সাথে থাকবে, বাইরে থেকে কখনই আসবে না। আমাদের মনে হতে পারে ঠাকুরের মধ্যে তো এই ছয়টি ঐশ্বর্য দেখা যেতো না। কিন্তু তা নয়, ঠাকুরের মধ্যেও এই ছয়টি ঐশ্বর্য সব সময় ছিল, তিনি কখন কোথাও দুর্বল ছিলেন না, ঠাকুরের তেজ কখন নিষ্প্রভ হতো না, তাঁর বল কখনই কম থাকতো না আর তিনি সর্বদা পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কথামৃতের পাতাগুলো খুলে যদি মিশিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয় তখন কেউ ধরতে পারবে না কোনটা আগের কথা কোনটা পরের কথা। কিন্তু স্বামীজীর কথাগুলো ধরা যায় কোনটা আগে বলেছেন আর কোনটা পরে বলছেন। কোথাও কোথাও স্বামীজি তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শকে সমাজে প্রয়োগ করার জন্য একটা আইডিয়া দিচ্ছেন। কিছু দিন পরে সেই আইডিয়াটাই আবার যখন দিচ্ছেন তখন তাতে যেন আরও তেজ বেড়ে গেছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই রকম হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত ঠাকুর যে ধর্মের কথাগুলো বলে গেছেন সেখানে কোথাও কোন বিবর্তন নেই, প্রথম পাতায় যা বলা আছে শেষের পাতাতেও একই জিনিষ বলা আছে। এটাকেই বলে জ্ঞানখল, জ্ঞানে তিনি প্রতিষ্ঠিত যা কিনা অবতারের একটি প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আজকে এক রকম বললেন, পরে সেটাকেই আরেকটু ভালো করে বললেন বা বলছেন যে আমি ঠিক ওই কথা বলতে চাইনি, এই ধরণের কথার কোন মারপ্যাঁচ নেই। ঠাকুরের কথাগুলো একেবারে খাঁটি সোনা কোথাও কোন খাদ মেশানো নেই। ঠাকুরের কাছে টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐশ্বর্য সব সময় ছিল। ঐশ্বর্যের অভাবকে বলা হয় অনৈশ্বর্য। অনৈশ্বর্য দেখলেই বোঝা যায়, যেন একটা অলক্ষ্মী বিরাজ করে আছে। ঠাকুরের অলক্ষ্মীর চিহ্ন কখনই ছিল না। কথামৃতে দেখা যায় ঠাকুর এই অলক্ষ্মীর ব্যাপারটাকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করছেন, নোংরা জামা-কাপড়, ছেঁড়া ধুতি জামা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। জামা-কাপড় ছিঁড়ে যেতেই পারে, কিন্তু সেলাই করে নাও, তাই বলে ছেঁড়া কাপড় কেন ব্যবহার করবে!

ভগবানের এই ষড়ৈশ্বর্য রয়েছে বলে এই ছয়টি ঐশ্বর্য অবতারের মধ্যেও থাকে। এটাই ভগবানের মূল প্রকৃতি। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ভগবান কে, তখন তাকে বলতে হবে যাঁর মধ্যে

ষড়ৈশ্বর্য অর্থাৎ জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল ও তেজ সব সময় আছে। সাধারণ মানুষের জ্ঞান দিনে দিনে বাড়ে, আগে আমি অনেক কিছু জানতাম না, কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে করে, আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা শুনে শুনে আমার ধীরে ধীরে জ্ঞান বাড়তে থাকে। একটা কিছু বিপর্যয় হলেই আমরা মানসিক ভাবে একেবারে ভেঙে পড়ছি, কাজ করতে ইচ্ছে করে না, মন হতাশায় ভরে যায়। তার মানে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় গুণ নেই। ভেতরে ঈশ্বরীয় গুণ থাকলে বিপর্যয় হলে ধাক্কা যে খাবে না তা নয়, ধাক্কা লাগবে কিন্তু ধাক্কা খেয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে।

ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য, আচার্য এখানে মায়ার কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে মায়াকে বিশ্লেষণ করছেন। অনেকের ধারণা যে আচার্য ঘোর বেদান্তী, ঈশ্বর মানেন না, তাঁর কাছে জগৎ মিথ্যা। আসলে এদের কারোরই শাস্ত্র অধ্যয়ন নেই, অধ্যয়ন করলেও বোঝার চেষ্টা করে না, কিন্তু এদিক সেদিক থেকে দু চারটে কথা শুনে বিজ্ঞের মত মন্তব্য করে বসে। মায়া বলতে আমরা মনে করি ম্যাজিক, কিন্তু মায়া কখনই ম্যাজিকের মত নয়, মায়া হল ত্রিগুণাত্মিকা। মায়া পুরোদমে রয়েছে আর তার মধ্যে তিনটে গুণ আছে – সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্ত্ব মানে স্থিতি, শুভ। রজ মানে গতি আর তম মানে স্থবির। সত্ত্ব এই রজ ও তমের মধ্যে সাম্য নিয়ে আসে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চে যাবতীয় যা কিছু আছে সব এই তিনটে গুণ দিয়ে নির্মিত। ফলে সব কিছুর মধ্যে এই তিনটে কম বেশী থাকবে, কোথাও সত্ত্ব বেশী, কোথাও রজ আবার কোথাও তম বেশী। কিন্তু এই তিনটে গুণ সব কিছুর মধ্যেই থাকবে। আমরা বলে থাকি ঠাকুর হলেন শুদ্ধসত্ত্ব, তার মানে এই নয় যে ঠাকুরের মধ্যে রজ আর তম ছিল না। তম না থাকলে ঘুম হবে না, আমরা যে নিদ্রা যাই সেটা তমের জন্য সম্ভব হয়। আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করছি, ভুক্ত জিনিষ হজম করছি এগুলো সব রজগুণের জন্য হচ্ছে। আর আমরা যে দুটো ভালো কথা শুনতে চাইছি, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করছি এগুলো সত্ত্বগুণের প্রভাবে হয়। সব কিছুর মধ্যেই, এমনকি সাপ, বিছে, গরু, বাঘ সবার মধ্যে এই তিনটে গুণ কম-বেশী থাকতে বাধ্য।

ভগবান হলেন ত্রিগুণাত্মিকা আর তার সাথে বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবী মানে, এই ত্রিগুণাত্মিকা হল ভগবান বিষ্ণুর শক্তি। অনেকে বলে অদ্বৈতীরা শক্তি মানে না, তাহলে আচার্য লিখলেন কি করে, এই মায়াটা অন্য কিছু নয়, এটাই ভগবান বিষ্ণুর শক্তি, এটাই বৈষ্ণবী। যেমন আমি আছি আর আমার জামা আছে জামা আলাদা আমি আলাদা। সেই রকম ভগবানের বৈষ্ণবী শক্তি আর ভগবান কি আলাদা; আচার্য শেষের দিকে বলবেন শক্তি আর শক্তিমান দুটোতে কোন তফাৎ নেই, শক্তিও যা আর শক্তিমানও তাই। ঠাকুর বলছেন সাপ কুণ্ডুলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ আবার হেললে দুললেও সাপ, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি এক। অগ্নি মানেই দাহিকা শক্তি, দাহিকা শক্তি মানেই অগ্নি। এটাকে ভাগবতাদি গ্রন্থে অনেক সময় বলে ভগবানের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এগুলো আছে। এগুলো এক ধরণের ব্যাখ্যা, কিন্তু বেদান্ত ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করবে না। কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করলে দর্শন তত্ত্বে অন্য অনেক জটিল সমস্যা এসে যাবে। আচার্য তাই

সেদিক দিয়ে যাচ্ছেনই না, তিনি বলছেন বৈষ্ণবী শক্তি যেটা সেটা ভগবানেরই শক্তি, বাইরে থেকে কিছু আসেনি। আর বলছেন *স্বাং মায়াং* এটা তাঁর নিজের মায়া, তাঁর মায়া আর তিনি কখনই আলাদা নন। শক্তি শব্দটা এখানে আচার্য ব্যবহার করছেন না, কারণ শক্তি শব্দ ব্যবহার করলে সৃষ্টিটা সত্য হয়ে যাবে। সৃষ্টি যদি সত্য হয় তাহলে মুক্তি কোন দিন হবে না। যে ভগবান আমাদের সুখ দেন, যে ভগবান আমাদের দুঃখ দেন সেই ভগবান তো পাগল। তিনি তো ঠিকই করতে পারছেন না কাকে কি দেবেন, এই ভগবান তো পুরোপুরি দ্বিধাগ্রস্ত ভগবান। জগৎ যদি সত্য হয় তাহলে আমিও সত্য, আমার সুখ-দুঃখও সত্য হবে। এই সুখ-দুঃখ থেকে আমরা কোন দিন বেরোতে পারবো না, কারণ তখন আমাদের বন্ধনটাও সত্য হবে। বন্ধন যদি সত্য হয় তাহলে কোন দিন আর মুক্তি হবে না। সেইজন্য এগুলোকে বলছেন ঈশ্বরীয় মায়া। ঈশ্বরীয় মায়া কি মিথ্যা? না, মিথ্যা কেন হবে! মায়া এমনই একটা জিনিষ যেটা আছে অথচ আবার নেইও। যতক্ষণ মায়ার মধ্যে আছি ততক্ষণ মায়া পুরো সত্য। আবার যখন মায়া থেকে বেরিয়ে যাবো তখন দেখবো – আরে জিনিষটা তো কখন ছিলই না। মায়ার মধ্যে থাকলে মায়া পুরো সত্য, আবার মায়া থেকে বেরিয়ে গেলে দেখব মায়া বলে কিছুই ছিল না। এর উপমা দিতে গিয়ে এনারা বলেন – আমি অন্ধকারে হাঁটছি। আমি এখন বলছি আমি এই অন্ধকারকে দেখতে চাই। কিন্তু অন্ধকারকে তো আর অন্ধকার দিয়ে দেখা যাবে না। তাহলে আমাকে আলো আনতে হবে। আলো আনলে আবার অন্ধকার থাকবে না। তাহলে আমি কি করে আর অন্ধকারকে দেখবো! আজ পর্যন্ত কেউ অন্ধকারকে দেখেছে বলে আমাদের জানা নেই। তার কারণ অন্ধকারকে অন্ধকার দিয়ে দেখা যায় না, আর আলো দিয়ে দেখতে গেলে অন্ধকার থাকে না। যতক্ষণ আমরা মায়াতে আছি ততক্ষণ মায়াকে জানা যাবে না, যেমনি আত্মজ্ঞানের আলো এসে গেল তখন মায়াই নেই, মায়াকে আর দেখবো কোথায়! অন্ধকারের সময় অন্ধকার পুরো সত্য, আলো এসে গেলে অন্ধকার মিথ্যা। মায়ার মধ্যে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ মায়া পুরো সত্য, আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে মায়া বলে কিছু থাকবে না। সেইজন্য এনারা মায়া শব্দটা ব্যবহার করছেন। আর মায়ার পেছনে এত কথা কেন বলতে হচ্ছে? কারণ সারা জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই মায়ার মধ্যেই আবদ্ধ।

মায়াকে এখানে আরেকটা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন *মূলপ্রকৃতিং*। সাংখ্য দর্শনে এই প্রকৃতি শব্দটা খুব ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতি মানে প্রকৃষ্ট রূপে যিনি এই জগৎ সৃজন করেন। শুধু প্রকৃতি নয়, আবার মূল প্রকৃতি, মানে এই হল আদি, এখান থেকেই যা কিছু বেরিয়েছে। এখানে আচার্য চারটে শব্দ ব্যবহার করছেন – ত্রিগুণাত্মিকা, বৈষ্ণবী, স্বাং মায়াং আর মূলাপ্রকৃতি। গীতাতেও বিভিন্ন জায়গাতে এই চারটে শব্দকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ এই মায়াকে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। ঈশ্বরকে যেমন বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না, তেমনি এই মায়াকেও বুদ্ধি দিয়ে জানা যাবে না। বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না বলে তার চার ধরণের পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। সাংখ্যবাদীদের মতে প্রকৃতি পুরোপুরি সত্য। তাহলে মূল প্রকৃতিও সত্য। কিন্তু আচার্য যে অনুসারে ব্যাখ্যা করছেন সেই অনুসারে প্রকৃতি সত্য নয়। অথচ আমি নিজেকে সত্য জানছি, সবাইকে সত্য বলে জানছি আর এই

জগৎকেও সত্য দেখছি। সত্য আছে কিন্তু তার আগে বলছেন মায়া, সেইজন্য এই মায়া absolute truth নয়। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় প্রায়শই Relative Truth শব্দটা ব্যবহার করতেন। জিনিষটা যে নেই তা নয়, আছে কিন্তু আপেক্ষিক সত্য। শুদ্ধব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, মায়ার দরুণ, আপেক্ষিক সত্যের জন্য সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে অংশ রূপে দেখাচ্ছে। আর দ্বিতীয় আমাকে, সবাইকে, জগতের সব কিছুকে আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে। এগুলো কোনটাই আমরা ভুল দেখছি না, কিন্তু পূর্ণকে অপূর্ণ দেখছি এটাই মায়া, এককে বিবিধ ভাবে পুরুষ নারী রূপে বহু দেখছি এটাই মায়া।

বশীকৃত্য, ভগবান তাঁর মায়াকে নিজের বশীভূত করে রাখেন, আমি আপনি যা কোন দিন পারবো না। আমরা সবাই মায়ার মধ্যে আছি, অবতার যিনি তিনিও মায়ার মধ্যেই অবতরণ করেন। তফাৎ হল, আমরা হলাম মায়াধীন, মায়ার অধীনে আর ভগবান মায়াধীশ, মায়াকে বশীকৃত করে রাখেন, তিনি মায়াকে তাঁর অধীনে রাখেন। এর খুব সুন্দর উপমা হল – ভারতের রাষ্ট্রপতি যখন চলাফেরা করেন তখন তাঁর চারিদিকে কমাণ্ডো ও পুলিশ ঘিরে রাখে, আবার যে দাগী আসামী তাকেও চারিদিকে পুলিশ ঘিরে রাখে। রাষ্ট্রপতি যেদিকে যাবেন কমাণ্ডো ও পুলিশ বাহিনী তাঁর পেছনে পেছনে যাবে। আর পুলিশ যেদিকে যাবে আসামীকেও সেই দিকে টেনে নিয়ে যাবে। মায়া জীবকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায় আর শিব মায়াকে নিজের মত চালান। ঠিক তেমনি আমার আপনার ক্ষেত্রে আমাদের মায়ার ইচ্ছামত চলতে হবে। এরপর আবার ভগবানের অনেক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিচ্ছেন।

তিনি *অজঃ অব্যয়ো।* অজঃ মানে যাঁর কখন জন্ম হয় না, অব্যয়ো মানে যাঁর কখন ব্যয় অর্থাৎ নাশ বা ক্ষয় হয় না, বলতে চাইছেন তিনি অবিনাশী। *ভূতানাং ঈশ্বরোঃ,* তিনিই সব কিছুর এবং সমস্ত জীবের ঈশ্বর। ঈশ্বর মানে যিনি নিয়ন্তা, যিনি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আর তিনি *নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবোহপি,* নিত্য মানে তিনি চিরন্তন, ভগবানের কবে জন্ম হয়েছে আর কবে মারা যাবেন এই প্রশ্ন কখনই করা যায় না। শুদ্ধ, তিনি একেবারে পবিত্র নির্মল, তাঁর উপর কোন রকম কিছুর প্রলেপ নেই। বুদ্ধ, জ্ঞানে পরিপূর্ণ, ভগবানকে যে সৎ চিৎ ও আনন্দ বলা হয়, তিনি সেই সচ্চিদানন্দের চিৎ। আর তিনি সব সময় মুক্ত, তাঁর মধ্যে কোন বন্ধনের চিহ্ন নেই। তিনি অজ, তাঁর কখন জন্ম হয় না, তিনি অব্যয় মানে তাঁর কোন ব্যয় হয় না, তিনি ভূতের ঈশ্বর আর তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত এটাই ভগবানের স্বভাব।

যিনি অজ, অব্যয়, সবার মালিক, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত, তিনি নিজের মায়াকে বশীভূত করে নিজের উপর চাপিয়ে নিজেকে ঢেকে দিচ্ছেন। তার ফলে কি হয়? যিনি মুক্ত স্বভাব এবার তিনি কি করছেন? *স্বমায়য়া,* নিজের মায়াকে আশ্রয় করে *স দেহবানিব জাত,* দেহবানদের মতই যেন তিনি জন্ম নেন। দেহবান মানে আমার আপনার মত, আমরা সবাই দেহবান। আমরা বলি আমার কর্মের জন্য আমার সুখ-দুঃখ আসে, আমার কর্মের জন্য আমার জন্ম হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে। যারাই দেহবান,

যাদেরই জন্ম-মৃত্যু আছে এরা সবাই ধর্মের মধ্যে এবং কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। ভগবান যখন জন্ম নেন তখন তাঁকেও দেহবান বলেই মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো আকাশ থেকে নেমে আসেননি, তাঁকেও কামারপুকুরে মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিতে হয়েছিল। তখন কি কারোর মনে হয়েছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার হয়ে জন্ম নিয়েছেন। আজকে তো বেলুড় মঠ, কামারপুকুরে চারিদিক থেকে লোক দৌড়ে আসছে। কারণ একটাই, *দেহববানিব জাত*, যদি দেহবান না হয়ে অন্য ভাবে জাত হত তাহলে তো সেটা ম্যাজিক হয়ে যাবে, তখন কে যাবে তাঁর কাছে!

কেন তিনি এইভাবে জন্ম নেন? *ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতো* দেখা যায়, ভগবান অবতার হয়ে দেহ ধারণ করে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। অবতারের কোন কাজ কখনই নিজের স্বার্থের জন্য হয় না। সেইজন্য তাঁর মধ্যে কোন কর্মও সঞ্চিত হয় না, যা কিছু করেন সব কিছু অপরের মঙ্গলার্থে করে যান। সেই কর্মটাও *ইব লক্ষ্যতে*, সংস্কৃতে ‘*ইব*’ শব্দের অর্থ মনে হয় যেন। *দেহবানিব*, মনে হয় যেন ভগবান দেহবানদের মত জন্ম নিয়েছেন, *ইব লক্ষ্যতে*, মনে হয় যেন লোকেদের মত কাজ করছেন। মনে হয় এই কথাটা যদি না বলা হয় তাহলে ঈশ্বরের উপরে নানান রকমের দোষ এসে যাবে। ঈশ্বর যদি জন্ম নেন তাহলে তিনি দেহধর্মী হয়ে গেলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তো একে বেশী ভালোবেসেছেন, তাকে বকাঝাকা করেছেন, তাহলে তো ভগবানের বৈষম্য দোষ এসে যাবে। কিন্তু তা নয়, উনি এগুলো কিছুই করেন না। করেন না মানে! তাহলে তাঁর জন্মটা কি? তিনি কাজ করছেন, কত কিছুই তো করছেন এগুলো তাহলে কি? এই জিনিষটাকেই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আচার্য বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবেন।

অবতার রূপ ধারণ করে ভগবান লোকের অনুগ্রহ করেন। অনুগ্রহ করাটা কি? *স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি*, ভগবানের নিজের কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে বলেই আমরা কাজ করি। প্রয়োজন ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না। আমাদের প্রয়োজনটা কোথায়? আমাদের মধ্যে অবিদ্যা আছে, অবিদ্যা থেকে আসে কাম, কামনা-বাসনা এলেই প্রয়োজন হবে, প্রয়োজন মেটাতে কাজ করতে হবে। তার মানে সংসারী মানুষ কক্ষণ এমন কোন কাজ করবে না যার পেছনে তার কোন স্বার্থ থাকবে না। প্রত্যেকটি সংসারী লোক, সে যেই হোক, মা হোক, বাবা হোক, নেতা হোক সবারই স্বার্থ ছাড়া কিছু নেই। স্বার্থ ছাড়া জগতই হবে না। জগৎ মানেই স্বার্থ, স্বার্থ মানেই জগৎ। তাহলে অবতার কি? *স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি*, অবতারই একমাত্র নিঃস্বার্থ হন। যে কোন অবতারের জীবনের দিকে তাকাই না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের জীবনে কোথাও কোন স্বার্থের লেশ মাত্র ছিল না। যাঁরা খুব উচ্চমানের ঋষি, মহাপুরুষ, মহাত্মা, তাঁরা ঈশ্বরের মতই হয়ে যান, এনারাও স্বার্থশূন্য। অবতার আর এনারদের যা কিছু কর্ম সবই জগতের মঙ্গলার্থে। এখানেও তাই বলছেন *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, সাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যান। সাধুপুরুষ কে? অপরের কষ্ট দেখলে যার নিজের কষ্ট অনুভব হতে থাকে। তখন তিনি আর সেই কষ্টটা নিতে পারেন না। যখন আর নিতে পারেন না তখন লোকের মঙ্গল করার জন্য নেমে পড়েন। স্বামীজী বলছেন এই ভারত

ভূমির একটা কুকুরও যদি অভুক্ত থাকে সেটাও আমি দেখলে সহ্য করতে পারবো না। *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া* যে শব্দটা আচার্য এখানে অবতারের জন্য ব্যবহার করেছেন, তা খুবই যথার্থ। অবতার পুরুষরা হলেন একটা স্বচ্ছ আয়না, যেখানে মানুষের সব দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই তাঁরা উঠে পড়ে লেগে যান জীবের দুঃখ-কষ্টের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কাতর হয়ে ভবতারিণীর কাছে বলছেন – মা কলকাতার লোকগুলো অন্ধকূপে পোকার মত কিলবিল করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দু পয়সার পূজারী, সে আবার কলকাতার বড়লোকেদের বলবে অন্ধকারের পোকার মত কিলবিল করছে! কিন্তু সত্যিই তাই। যাঁদের দিব্য দৃষ্টি আছে তাঁরা জানেন আমরা সবাই কিভাবে পোকার মত কিলবিল করছি।

তখন তিনি কি করেন? *বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়ং* তিনি মানুষকে বেদে যে দুটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের শিক্ষা দেন। আমাদের শাস্ত্রে নানান রকমের দানের কথা বলা হয়, অন্ন দান, শিক্ষা দান, প্রাণ দান, বিদ্যা দান, ধর্ম দান ইত্যাদি। এর মধ্যে বিদ্যা দান আর ধর্ম দানের মত আর কিছু দানে হয় না। একজনকে অর্থ দান করলে কদিন পরে সেই অর্থ শেষ হয়ে যাবে। কাউকে যদি প্রাণ দান করা হয় কদিন পর প্রাণ হারানোর ব্যবস্থা সে নিজেই আবার করে নেবে। কিন্তু যদি বিদ্যা কাউকে দান করা হয় আর কোন দিন সেটা নষ্ট হবে না। যে কোন সমাজের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের কাজ হল সাধারণ মানুষকে বিদ্যা দেওয়া। কিন্তু এখন আমাদের দেশের নেতারা ওইটা বাদে সবই করছে। একবার বিদ্যাটা শিখিয়ে দিলে তার জীবনে আর কষ্ট হবে না। ধর্ম দান যদি করা হয়, অর্থাৎ মানুষকে যদি মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হয়, যদিও এটা বিদ্যা দানই, তখন তাকে পরের জন্মেও কোন কষ্ট ভোগ করতে হবে না। তাই অবতার যখন আসেন তখন তাঁর প্রধান একটা কাজ হল বিদ্যা দান। কিভাবে তিনি বিদ্যা দান করেন? যেমন বেদের যে দুটি ধর্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম অর্জুনকে ভগবান শিক্ষা দিলেন। কোন্ অর্জুনকে? *শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ*, যে অর্জুন শোক আর মোহের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। শোক মানে, আমার কাছে একটা জিনিষ আছে সেটা হারিয়ে গেছে বা হারাতে যাচ্ছে তখন সেই জিনিষটার জন্য শোক হয়। আর মোহ মানে, একটা জিনিষ আমার কাছে নেই কিন্তু আমি সেটা পেতে চাইছি। ডাক্তার ছেলের মাকে বলে দিল, মা! আমার আর কিছু করার নেই এখন সব ভগবানের হাতে। তখন ছেলেকে হারাবার ভয়ে মায়ের যে কষ্ট হবে সেটাই শোক। এখনও ছেলেটি মারা যায়নি কিন্তু শোক এসে মাকে গ্রাস করে নিয়েছে। আর যে মায়ের সন্তান হয়নি, একটা সন্তানের জন্য তার যে কি তীব্র আকাঙ্খা কল্পনা করা যায় না। কত ডাক্তার দেখাচ্ছে, মন্দিরে পূজা দিচ্ছে, কবচ ধারণ করছে কত কি করে যাচ্ছে শুধু একটি সন্তান পাওয়ার আশায়, এটাই মোহ। শোক আর মোহ এটাই সংসার। ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চনই সংসার আর আচার্য বলছেন শোক আর মোহই সংসার। মানুষের প্রথমেই মনে হয় – আহা! আমি যদি তার একটু ভালোবাসা পেতাম। যখন ভালোবাসা পেয়ে গেল তখন দুশ্চিন্তা, সে যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন আমার

কি হবে, এটাই সংসার। আমরা সবাই এই সংসারে মোহের পুর্তির জন্য আর শোক লাঘবের জন্য চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু যাঁরা রোদ, জল, ঝড়, ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন বেলুড়ে এখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আসছেন এটা কোন শোক লাঘবের জন্য বা মোহের পুর্তির জন্য আসছেন না, এটাই একমাত্র একটা শুভ কাজ। শোক মোহ মানে হল আমাদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের তুষ্টি আর এর রক্ষণ বেক্ষণ। কিন্তু এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসাটা এগুলোর কোনটাই নয়। আর এর বাইরে সারা দিন বাকি যা করছি সবটাই শোক আর মোহের জন্য করা।

অর্জুন আবার শুধু শোক মোহে নেই, শোক মোহের যে মহাসাগর তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা তো শোক মোহের কুয়োর মধ্যে পড়ে আছি আর অর্জুন শোক মোহের মহাসাগরে নিমগ্ন হয়ে আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অর্জুনকে দুটো ধর্ম এক সঙ্গে শিক্ষা দিলেন। যে কোন ধর্মেই যদি দুটো ধর্মের শিক্ষা না দেওয়া হয় তাহলে সেই ধর্ম কখনই সম্পূর্ণ ধর্ম হয় না। যেমন বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম থেকেই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের শিক্ষা দেয়, এদের প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ছিল না। আরও আশ্চর্যের যে বাইবেল হল পুরো নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। পুরো বাইবেলে কোথাও প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম অর্থাৎ সংসারীরা কিভাবে চলবে তার কোন আলোচনা নেই। ইসলামের মূল কাঠামোতে যেটা পাওয়া যায় সেটা পুরোপুরি প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। কিন্তু ওদের যে সুফি সম্প্রদায় তাদের আবার পুরোপুরি নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। সেইজন্য সুফিদের ছাড়া ইসলাম কখনই সম্পূর্ণ ধর্ম হবে না। যাই হোক, ভগবান অর্জুনকে এই দুটো ধর্মের উপদেশ দিলেন যাতে সে এই শোক মোহের মহাসমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। সেইজন্য যে গীতা পাঠ করছে তার কোন দুঃখ-কষ্ট হওয়ার কথা নয়। গীতা শোনার পরেও যদি দুঃখ কষ্ট হয়, তার মানে গীতা তার মাথায় একটুও ঢোকেনি।

সেই সময় এত বড় বড় লোকরা থাকতে ভগবান অর্জুনকেই কেন এই শিক্ষাটা দিলেন? আচার্য এর উত্তরে বলছেন *গুণাধিকৈর্হি গৃহিতঃ অনুষ্ঠিয়মানশ্চ ধর্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি*, এখানে খুব মজার কথা বলছেন। গুরু সব সময় ভালো শিষ্য খুঁজে বেড়ান, কারণ ভালো উপযুক্ত শিষ্য যখন বিদ্যাটা গ্রহণ করে এবং সেই বিদ্যানুযায়ী আচরণ করে তখনই সেই বিদ্যার প্রচার প্রসার হয়। যদি অনুপযুক্ত লোকের হাতে এই বিদ্যা যায় তাহলে ধর্মের পতন অবশ্যাম্ভাবি। গুণী মানুষ যখন ধর্মের শিক্ষা পায় এবং সেই রকম আচরণ করে তখনই ধর্ম শক্তিশালী হয় এবং প্রচার পায়, তার আগে কোন অবস্থাতেই ধর্মের প্রচার হয় না। ঠাকুরের ভাব নিয়ে স্বামীজী ছাড়া আরও অনেকে ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেমন সত্য সাঁই বাবা, তিনি বলছেন আমি ঠাকুরের কথামৃত রোজ পাঠ করি। স্বামী চিন্ময়ানন্দজীও ঠাকুরের ভাবধারাকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর man making character building idea গুলোকে নিয়ে পুরো জীবনটা তাতে ঢেলে দিয়েছে এই রকম একটি ব্যক্তিকেও কোন ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে না। তাহলে কি স্বামীজী আমাদের আদর্শ নয়? অবশ্যই তিনিই আমাদের সবার আদর্শ। কিন্তু সমস্যা হল, এই আইডিয়াগুলো যাচ্ছে কত কগুলো অযোগ্য লোকেদের হাতে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে পেয়েছিলেন, ঠাকুর যেমন নরেনকে পেয়েছিলেন, সেই

রকম স্বামীজী আর কাউকেই পেলেন না। সেইজন্য আচার্য এখানে বলছেন ধর্মের প্রচারের জন্য সব সময় দরকার উপযুক্ত যোগ্য শিষ্যের। শিষ্য কি রকম হবে; *গুণাধিকৈর্হি* গুণে ভরপুর থাকবে, গুণের প্রভাবে একেবারে টগবগ করে ফুটবে। অর্জুনের মধ্যে কত গুণ ছিল। এই রকম শিষ্য কি করে; *গৃহিতঃ অনুষ্ঠিমানশ্চ ধর্মঃ* ধর্মকে গ্রহণ করবে আর নিজে পালন করে সবার সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

তং ধর্মো ভগবতা যথোপদিষ্টং এই যে প্রবৃত্তিলক্ষণ আর নিবৃত্তিলক্ষন দুটি ধর্মের কথা অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সেটাকেই ব্যাসদেবস *সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈঃ উপনিববন্ধ*, সাতশটি শ্লোকের মধ্যে বেঁধে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কিছু কথা বলেছিলেন, হয়তো তিনি দশ মিনিট কি পাঁচ মিনিট বলেছিলেন কিংবা হয়তো কুড়ি মিনিটি ধরেও বলতে পারেন আর সেটা আলোচনার মাধ্যমে বলেছিলেন। এই পুরো কথাবার্তা টুকুকে ব্যাসদেব, যিনি একজন গুণী মানুষ, তিনি সাতশটি শ্লোকের মধ্যে বেঁধে দিলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যকামের ছোট্ট একটা গল্পকে ব্রাহ্মণ কবিতার আকারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ঠিক তেমনি অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণের যে সংবাদ, তাকে ব্যাসদেব, যিনি একজন নিজে বড় কবি ছিলেন, কবিতার আকারে সাতশটি শ্লোকে রচনা করে দিলেন। সেইজন্য গীতা একদিকে ভগবানের কথা আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে গীতা ব্যাসদেবের রচনা। কিন্তু ব্যাসদেবের রচনা এইজন্য হবে না কারণ মূল কথাটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। অনেকে প্রশ্ন করেন যুদ্ধের আগে সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তখন শ্রীকৃষ্ণ তিন ঘন্টা ধরে অর্জুনকে এত সুন্দর কবিতার ছন্দে উপদেশ দিলেন কি করে; শ্রীকৃষ্ণ কবিতার ছন্দে কিছু বলেননি। বক্তব্যটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু সেটাকে কবিতার ছন্দে সাজিয়ে দেওয়ার কাজটা ব্যাসদেবের।

তদিদিং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞায়ার্থং তদর্থাবিষ্করণায় অনেকৈর্বিবৃতপদার্থবাক্য-বাক্যার্থন্যায়ং অপি অত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণং উপলভ্যাহংবিবেকতোহর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতোবিবরণং করিষ্যামি।

এই গীতাতে কি দেওয়া আছে; আচার্য খুব সুন্দর বলছেন – *তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসার- সংগ্রহভূতং* সমস্ত বেদের সারের যে সংগ্রহ সেটাই গীতাতে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য গীতা *দুর্বিজ্ঞায়াম্*, একেবারে দুর্বিজ্ঞ, গীতার বক্তব্য বোঝাটা প্রায় একেবারেই অসম্ভব। এটা অন্য কেউ বলছে না, স্বয়ং আচার্য শঙ্কর বলছেন গীতা বোঝা প্রায় অসম্ভব। সমস্ত বেদের সার, বেদের সার মানে সমগ্র হিন্দুধর্মের সার গীতার মধ্যে দেওয়া আছে। সেইজন্য গীতার মত কঠিন গ্রন্থ আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে আর নেই।

আগেকার দিনে যত বড় বড় পণ্ডিতরা ছিলেন তাঁরা নানান ভাবে গীতার অর্থ নিরুপণের জন্য বিভিন্ন ভাবে গীতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে আচার্য কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করছেন, *বিবৃতপদার্থবাক্যবাক্যার্থন্যায়ং অপি*, আগেকার দিনে পণ্ডিতরা কোন নামকরা শাস্ত্রের যখন সাধারণ অর্থ করে দিতেন তখন ওটা এক ধরণের লেখা হয়ে যেত, বাক্যের অর্থ করে লিখলে, পদ

অন্বয় করে লিখলে আরেক ধরণের লেখা হয়ে যেত। আবার কোন কোন পণ্ডিত গ্রন্থের টীকা লিখতেন, কেউ ভাষ্য লিখতেন তাছাড়া দীপিকা নামে এই ধরণের নানান রকমের রচনা করতেন। গীতার উপরেও বিভিন্ন পণ্ডিতরা এইভাবে অনেক ধরণের লেখা লিখেছেন। যে যেভাবে ব্যাখ্যা বা অর্থ করতেন সেই অনুসারে রচনার নাম পাল্টে যেত। আচার্যের সময়েই দেখা যাচ্ছে গীতার উপরে পণ্ডিতরা কেউ অর্থ বার করার জন্য লিখেছেন, কেউ অন্বয় করে গেছেন, কেউ টীকা, কেউ ভাষ্য রচনা করে গেছেন। আমাদের মত সাধারণ লোক, যাদের সেই রকম পাণ্ডিত্য নেই, তারা যখন গীতার উপর এত ধরণের বই দেখে, আর শুধু এত রকমের গীতাই নয়, তার উপর অত্যন্ত বিরুদ্ধ, এই গীতাতে এক রকম কথা বলছে অন্য গীতায় আরেক রকম অর্থ করছে, সাধারণ লোকের মাথা গুলিয়ে যায়। যখনই কোন পণ্ডিতের মনে হল এই ব্যাপারটা অন্য কোথাও লেখা হয়নি তাই আমাকে লিখতে হবে। কিংবা জিনিষটা এই ভাবে লেখা উচিৎ হয়নি তাই তিনি আরেক ভাবে লিখে দিলেন। যার ফলে কারোর লেখার সাথে কারোর মিল নেই। গীতা একেই এত উচ্চ দর্শন তার উপর এত দুর্বিজ্ঞেয়, সেই গীতার এত ধরণের লেখা পড়লে সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝবে না, উল্টে সব কিছু গুলিয়ে যাবে। আচার্য শঙ্করের ভাষ্য পড়ার পর রামানুজের গীতার ভাষ্য পড়লেই মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে দেবে। মনে হবে যা কিছু শিখেছিলাম সব গোলমাল হয়ে গেল। আচার্য শঙ্কর গীতা ভাষ্য রচনা করেছেন সপ্তম শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় চোদ্দশ বছর আগে। এখনকার মত তখন ছাপাখানা ছিল না, সব হাতে লেখা হত। গীতা তখনই পণ্ডিতদের মধ্যে খুব সমাদৃত হয়ে গিয়েছিল, আর পণ্ডিতদের অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে রাখতে হত। আর সব গ্রন্থ ছিল তালপত্রের উপর। তার মানে প্রত্যেকটা কপি ছিল একেবারে স্বতন্ত্র। কেউ যদি কারোর বই কপি করে নিতে চাইত তখন সেই সময়ে কপি করার লোক থাকত, সারা দিন তারা তালপত্রে কপিই করে যেত। তালগাছের পাতাকে শুকিয়ে নির্দিষ্ট মাপে কাটা হত। এরপর সেই তালপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় একটা ছিদ্র করে দিত। এখনকার ডট পেনের মত একটা লোহার শলাকে লেখার কাজে ব্যবহার করতেন। পাতার উপর লেখা হয়ে গেলে কাঠ কয়লা এবং আরও অন্যান্য জিনিষ মিশিয়ে একটা কালো রঙ তৈরী করে সেটাকে পাতার উপর ছড়িয়ে দিতেন। গর্তের মধ্যে কালো রঙ বসে গিয়ে অক্ষর গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠত। ওই রঙটা পাকাপাকি বসে যেত আর উঠে যেত না। এখনও যে সব পুঁথি পাওয়া যায়, যেগুলো এই পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে সেগুলো এখনও স্পষ্ট আছে। পরের দিকে কালি ও কলমের আবিষ্কারের পর যেসব লেখা হয়েছে সেগুলো বরং অনেক ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কিন্তু এই ধরণের পুঁথি এখনও আগের মতই স্পষ্ট আছে। লিখতে গিয়ে যদি কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত, কারণ ওই লেখা থেকে যখন কপি হবে তখন ভুল শুদ্ধুই কপি হয়ে যাবে। সেইজন্য ওনারা কখনই বেদ লিখতে দিতেন না। কপি করতে গেলে এক আধটা ভুল হবেই। পাশ্চাত্যের আবার উল্টো চিন্তা ভাবনা। প্রায়ই একটা কথা বলা হয়, লিখিত কিছু দিয়ে দিলে সেটাই বিরাট প্রমাণ। কিন্তু ভারতে এই ধরণের কোন লিখিত জিনিষকে বিশ্বাস করা হতো না।

আচার্য তখন বলছেন *অহং বিবেকতোহর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।* এই যে নানান রকম সংশয় হয়ে আছে এটাকে দূর করার জন্য আমি সংক্ষেপে গীতার অর্থের বিবরণ দিচ্ছি। আচার্যের গীতার ভাষ্য এমনই সংক্ষেপে যে, আনন্দগিরি আবার আচার্যের গীতার ভাষ্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তাতেও অনেক কিছু পরিষ্কার হয় না, তখন মধুসূদন সরস্বতী এর উপর লিখলেন গূঢ়ার্থদীপিকা। তিনি সেখানে লিখছেন, যেখানে যেখানে আচার্য অর্থ পরিষ্কার করে দেননি আমি সেই অংশটাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছি। মধুসূদন সরস্বতীর গীতার উপর এই বইটি খুবই উচ্চমানের। আবার অনেক জায়গায় বলছেন, এই জায়গাটায় আচার্য অর্থ স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলে আমি আর এর উপর কিছু লিখলাম না। তার ফলে গূঢ়ার্থদীপিকা পড়ার সময় মাঝে মাঝেই আচার্যের ভাষ্যটাও পড়তে হয়। এগুলো হল আচার্যের যে ভাষ্য তার উপর আবার ভাষ্য। তার মানে কত কঠিন বই হতে পারে ভাবা যায় না। আচার্য তাই বলছেন আমি সংক্ষেপে এর বিবরণ করছি। যদিও ভাষ্য মানে একটা দর্শনকে দাঁড় করানর প্রয়াস।

তস্য অস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্য অত্যন্তোপরমলক্ষণম্। তচ্চ সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্মাদ্ভবতি। তথা ইমমেব গীতার্থধর্মং উদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং 'স হি ধর্মঃ সুপর্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে' (ম.ভা.-১৪/১৬/১২) **ইত্যনুগীতাসু। 'তত্রৈব চোক্তং নৈব ধর্মী ন চাধর্মী ন চৈব হি শুভাশুভী'** ((ম.ভা.-১৪/১৯/৭) **'যঃ স্যাদেকায়নে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্'** (ম.ভা.-১৪/১৯/১) **'জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্'** (ম.ভা.-১৪/৪৩/২৬) **ইত চ। ইহাপি চ অন্তে উক্তং অর্জুনায় 'সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ** (**গীতা-১৮/৬৬**) **ইতি।**

আমাদের পরম্পরায় গ্রন্থ লেখার সময় একটা প্রথা অনুসরণ করতে হত। গ্রন্থ লেখার শুরুতেই লেখককে চারটে জিনিষকে স্পষ্ট করে বলে দিতে হত। একে বলা হয় অনুবন্ধ চতুষ্টয়। এই চারটে হল – অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ। অধিকারী মানে এই গ্রন্থটি কার জন্য লেখা হচ্ছে, এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী কে সেটাকে স্পষ্ট করে দিতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়, এই গ্রন্থের বিষয় বস্তু কি বলে দিতে হবে। এই গ্রন্থে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন আমাকে আগেই বলে দিন, যদি আমি মনে করি এর বিষয় বস্তুতে আমার আগ্রহ আছে তবেই আমি পড়ব। গ্রন্থের অধিকারী কে জানা হল, এই গ্রন্থের বিষয় বস্তু কি সেটাও জেনে গেলাম, কিন্তু এই বিষয় জেনে আমার কি লাভ হবে, আমার কি প্রয়োজনে লাগবে সেটাও বলে দিতে হবে, এটাই হল প্রয়োজন। চতুর্থ হল সম্বন্ধ, কোনটার সঙ্গে কার সম্বন্ধ আছে। আমাদের যে সব বই পাওয়া যায় সেখানে কোথাও অধিকারীর সঙ্গে প্রয়োজনের সম্বন্ধ দেখানো হয়, আবার কোথাও বিষয়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সম্বন্ধ দেখায়। কার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে এটাকে বলা হয় সম্বন্ধ। অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে এই চারটে জিনিষকে বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রন্থের প্রথমেই পরিষ্কার করে দিতে হত। যদিও আচার্য এখানে বলে দিচ্ছেন না এই গ্রন্থের অধিকারী কে। কিন্তু এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে যে কোন মুমুক্ষু, মুমুক্ষ মানে যাঁর মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা জেগেছে, যে

নিজের জীবনকে একটা উচ্চ আদর্শের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে তার জন্য এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অধিকারী হলেন মুমুক্ষু। আচার্য বোধ হয় এই কারণেই চুপ করে থাকলেন, যাতে গীতা সাধারণ লোক তাদের দৈনন্দীন কাজের জন্যও অধ্যয়ন করতে পারে। সেইজন্য মুমুক্ষু শব্দটা ঠিক ওই ভাবে অধিকারী হিসাবে ব্যবহার করেননি। কিন্তু আচার্যের ভাষ্যের উপর আনন্দগিরির যে টীকা আছে সেখানে তিনি অবশ্য মুমুক্ষদের অধিকারী বলছেন। ঠাকুরও বলছেন গীতা হল মোক্ষ শাস্ত্র। মোক্ষশাস্ত্র সব সময় মুমুক্ষুদের জন্য।

অধিকারীর কথা উহ্য রেখে আচার্য এখন বলছেন সংক্ষেপে আমি প্রয়োজন বলছি – *পরং নিঃশ্রেয়সং* মানে পূর্ণ মুক্তি, পূর্ণ মুক্তি মানে যেটাতে মানুষের সবচেয়ে মঙ্গল। *পরং নিঃশ্রেয়সং* মানে পরম কল্যাণ। পরম কল্যাণ কিসে হয়, আচার্য তার উত্তরে বলছেন *সহেতুকস্য সংসারস্য অত্যন্তোপরমলক্ষণম্*, এই যে সংসার, এই সংসারের একেবারে নাশ, সংসারকে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করে ফেলাটাই পরম কল্যাণ। সংসারের উচ্ছেদ করার খুব সহজ উপায় হল গলায় দড়ি দেওয়া, মরে গেলেই সংসার শেষ। এটাই আচার্যের বিশেষত্ব, তিনি তাঁর বক্তব্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখবেন না। আমি মরে গেলেই তো সংসার শেষ। সেইজন্য আচার্য এখানে বলছেন *সহেতুকস্য*, এই সংসারের পেছনে একটা হেতু রয়েছে। ওই হেতুটাকে নাশ করতে বলছেন। সংসারের হেতুকে নাশ না করে গলায় দড়ি দিলে তুমি আবার একটা সংসারে চলে যাবে। ঠাকুর বলছেন অপঘাতে মরলে প্রেতযোনীতে জন্ম নিতে হয়। চোখ বুজলে এই সংসার আমার কাছে সত্যিই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এখান থেকে আরেকটা সংসারে গিয়ে পড়ব, সেখান থেকে আবার আরেকটা সংসারে পৌঁছে যাব। এইভাবে ঘুরে ঘুরে আবার এই সংসারে ফিরে আসতে হবে। সংসারের উচ্ছেদ কখনই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, মৃত্যু কখন জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল মুক্তি। আচার্য মুক্তি না বলে বলছেন *পরং নিঃশ্রেয়সং* পরম কল্যাণ। কিসে পরম কল্যাণ, এই সংসারের পেছনে যে হেতু, সেই হেতুটাকে শেকড় শুদ্ধু উপড়ে ফেলতে হবে। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে আসবে *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্*, এই যে সংসার রূপ বটবৃক্ষ, এর শেকড়কে *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা*, অনাসক্তি রূপ তীক্ষ্ম ধারালো অস্ত্র দিয়ে এই বৃক্ষের শেকড়কে উপড়ে ফেল। না হলে এই সংসারের মধ্যে শুধু ঘুরপাক খেয়ে যেতে হবে। এই জন্মে চোখের জল আর মুখের হাসি তাও ভালো, কিন্তু সেটা আর কতক্ষণ চলবে, এরপর যখন ছাগল, ভেড়া, কুকুর, সাপ হয়ে জন্মাতে হবে তখন যে কি হবে কেউ জানে না। ছাগল হলে তো কাঁদতেও পারবে না হাসতেও পারবে না, তখন শুধু ভ্যা ভ্যা করতে হবে। সেইজন্য আচার্য বলছেন ভাই এই সংসারের হেতুটা, এর শেকড়াটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। এটাই গীতার প্রয়োজন, এটাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এই সংসারের উচ্ছেদ কিভাবে হবে, তখন বলছেন -

সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্মাদ্ভবতি। স্বরূপের জ্ঞান যদি হয়ে যায় তাহলেই সংসার উচ্ছেদ হয়ে যাবে। সংসার উচ্ছেদের জন্য তাই মৃত্যু কখন উপায় নয়, গাঁজা খাওয়া, ভাঙ্

খাওয়া কখন উপায় হতে পারে না। উপায় একটাই, আত্মজ্ঞান। যোগশাস্ত্রেও বলছে *তদাদ্রষ্টুঃস্বরূপে অবস্থানম্*। যোগ কি? *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*, মনের মধ্যে যত রকম চিন্তা উঠছে সব চিন্তাকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া। এটাই মুক্তি। মুক্তিতে কি হয়? তখন *তদাদ্রষ্টুঃস্বরূপে*, আমার যে নিজের স্বরূপ, সেই স্বরূপে অবস্থান। আচার্য বলছেন আত্মজ্ঞান যখন হয়ে গেল তখন সেটাই মুক্তি। আত্মজ্ঞান হওয়ার আগে কি হয়? আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা। আত্মজ্ঞান নিষ্ঠার আগে কি হয়? সর্বকর্মসন্ন্যাস, যত রকম কর্ম আছে সব কর্মকে সন্ন্যাস মানে ত্যাগ করে দিতে হবে, কোন কাজের প্রতি আসক্তি থাকবে না।

আচার্য যখনই বলছেন সর্ব প্রথমে কর্মসন্ন্যাস, কর্মসন্ন্যাসের পরে আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা এবং আত্মজ্ঞান নিষ্ঠার পরে আত্মজ্ঞান, তখন সব বিরুদ্ধবাদীরা আচার্যকে আক্রমণ করে বল উঠবে পুরো গীতা কর্মযোগের কথা বলছে আর আপনি কর্মসন্ন্যাসের কথা বলে দিচ্ছেন! এখানে আচার্য শুরুই করছেন কর্মসন্ন্যাস অর্থাৎ পূর্ণ কর্ম ত্যাগ দিয়ে। তাহলে তো বিরোধী কথা হয়ে গেল। আচার্য জানতেন বিরোধীরা এই নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। সেইজন্য তিনি আগে থাকতেই বলছেন – না এটাই ঠিক, গীতার এই ধর্ম অন্যান্য জায়গাতেও পাওয়া যায়। আচার্য তখন অনুগীতা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন।

অনুগীতা হল মহাভারতের একটি ছোট্ট অংশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে গেছে, যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হয়ে গেছে। তারপর কোন এক সময়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ‘প্রভু! যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আপনি আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে সেগুলো আমার মাথা থেকে হারিয়ে গেছে, আপনি যদি আবার সেই কথাগুলো বলেন তাহলে খুব ভালো হয়’। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনের উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান অর্জুনকে বলছেন ‘তুমি ওই জ্ঞানটা হারিয়ে ফেলে খুব অন্যায় করেছ কারণ যখন আমি তোমাকে গীতা বলেছিলাম তখন আমি যোগে অবস্থিত ছিলাম, এখন আমিও আর তোমাকে বলতে পারবো না’। বাস্তবিকই এই অবস্থা হয়। যাঁরা আধ্যাত্মিক শাস্ত্র নিয়ে কথা বলেন তখন তাঁদের কথাগুলো দুই রকমের হয় – একটাতে তাঁরা চিন্তা ভাবনা করে কিছু বলছেন, আর আরেকটাতে মা তাঁদের রাশ ঠেলে দেন। ঠাকুর কথামৃতে বলছেন – আমি প্রায়ই ঠিক করে রাখি আজকে তোমাদের এই এই কথা বলব কিন্তু যখন বলতে শুরু করি তখন সব গোলমাল হয়ে গিয়ে অন্য রকম কথা বলতে থাকি। এগুলোই ঠিক ঠিক উপদেশ। ঠাকুর ভেবে রেখেছেন তিনি এই কথা বলবেন কিন্তু ভাব জগৎ ঠাকুরকে ধরে নিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে অন্য রকম কথা বলাচ্ছেন। স্বামীজী বক্তৃতা দেওয়ার পর বলছেন আমি নিজেও জানতাম না আমার ভেতর থেকে এইসব কথা বেরোবে। স্বামীজী পরে তাঁর গুরুভাইদের মজা করে চিঠি লিখছেন ‘ওরে মোদো তোর ভেতরে এত আছে জানতাম না’। মা, যিনি বিশ্বজননী, তিনিই এই কথাগুলো ঠেলে ঠেলে বার করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেটাই বলছেন, আমি তোমাকে থোরাই বলেছি, তখন আমি যোগে

অবস্থিত ছিলাম, ওই অবস্থায় আমি কি বলেছি সেটা আমারই মনে নেই, তোমার উচিৎ ছিল এই জ্ঞানটাকে ধরে রাখা। তবে আমি তোমাকে কয়েকটি সার কথা বলছি, যা গীতারই সার।

অনুগীতা হল যেটা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি থেকে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, ভগবানের বুদ্ধি থেকে আসা আর হৃদয় থেকে আসাতে কোন তফাৎ থাকে না। কিন্তু যোগে অবস্থিত শব্দের সাথে সাধারণ অবস্থায় মুখ থেকে বেরনো শব্দের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। স্বামীজী যখন আমেরিকায় Sisters and brothers of America বলছেন তখন তিনি সেটা যোগ অবস্থায় বলছেন। আবার যখন তিনি স্বামী-শিষ্য সংবাদে কথা বলছেন সেটা আবার অন্য একটা অবস্থা, দুটো অবস্থার মধ্যে তফাৎ থাকবেই। স্বামীজী যখন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ভারতে বক্তৃতা দিচ্ছেন সেগুলো সব একটা অবস্থায় বলছেন বলে তেজোদীপ্ত কিন্তু যখন সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন তখন তিনি যোগ অবস্থায় বলছেন না। তবে এনারা এত উচ্চস্তরের মহাপুরুষ যে এনাদের যোগ অবস্থা আর অযোগ অবস্থা বলে কিছু হয়ও না।

যাই হোক আচার্য তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে অনুগীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন '*স হি ধর্মঃ সুপর্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে*' এই জ্ঞান নিষ্ঠাই ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য ঠিক ঠিক অবস্থা। তাছাড়া আরও কয়েকটা উদ্ধৃতি টেনে বলছেন সবাই একই কথা বলছেন, যতক্ষণ তোমার সন্ন্যাস না হয়, মানে সব কিছু ত্যাগ না করে দিচ্ছ ততক্ষণ তোমার আত্মজ্ঞান হবে না। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছেন, সংসারে থেকে কি হবে না; ঠাকুর বলছেন কেন হবে না! এখানে কিন্তু আচার্য বলছেন হবে না। কেন আচার্য এই রকম বলছেন সেটা মূল গীতার ভাষ্যে পরিষ্কার করা হয়েছে। তবে ঠাকুর যা বলছেন আর আচার্যও একই কথা বলছেন। তারপরেই আচার্য বলছেন *ইহাপি চ অন্তে উক্তং অর্জুনায়*, এখানেও মানে গীতাতেও শেষ অর্জুনকে ভগবান বলছেন '*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*', তার মানে গীতাতে সব কিছু বলার পরে শেষে বলছেন বাকি সব ধর্ম ছেড়ে আমার শরণে এসো। ধর্ম বলতে এখানে বোঝাচ্ছেন সমস্ত রকমের সাংসারিক কর্তব্য, দায়ীত্ব। তাহলে কি সবাই বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, স্বামীর প্রতি কোন কর্তব্য কর্ম করবে না; একবারও সেই কথা বলা হচ্ছে না, তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে, কিন্তু সংসারের প্রতি নির্ভরতাটা ছাড়তে হবে। সব ছেড়ে তুমি কার উপর নির্ভর করবে; ভগবানের উপর, ভগবানই আমার সব কিছু। *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য* এটাই তো প্রকৃত সন্ন্যাস। ঠাকুর বার বার বলছেন শরণাগতি! শরণাগতি! শরণাগতি মানেই সন্ন্যাস। ঠাকুর যখন বলছেন সংসারে থেকে কেন হবে না! আসলে তিনি এটাই বলতে চাইছেন। তুমি যে এখন তোমার টাকার উপর, তোমার বাড়ি, তোমার স্ত্রী, স্বামী, বাবা, মার উপর নির্ভর করে আছ, এই নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসো। এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর। কিন্তু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা কি অত সোজা! ভক্ত যখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে তখন তার বিপদে ভগবান দৌড়ে আসেন তাকে বাঁচাতে, কিন্তু মাঝ পথ থেকেই ঈশ্বরকে আবার ফিরে যেতে হয়। এই গল্পই কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, বৈকুণ্ঠে ভগবান লক্ষ্মীর সাথে বসে আছেন।

লক্ষ্মী দেখলেন ভগবান হঠাৎ সিংহাসন থেকে নেমে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখেন ভগবান ফিরে এসে আবার সিংহাসনে বসে পড়লেন। লক্ষ্মী তখন জিজ্ঞেস করছেন 'প্রভু, আপনি হঠাৎ করে কোথায় চলে গিয়েছিলেন'। ভগবান বলছেন 'এক ভক্ত আমার নাম করতে করতে যাচ্ছিল। ধোপারা কাপড় শুকোতে দিয়েছিল, বেচারা ভাবের ঘোরে ছিল বলে বুঝতে না পেরে কাপড় মাড়িয়ে দিয়েছে। ধোপা তখন একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে তাকে মারতে আসছে দেখে আমি তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম'। 'কিন্তু আবার ফিরে এলেন কেন'? 'দেখলাম নিজেকে বাঁচাবার জন্য ভক্ত একটা ইট তুলে নিয়েছে'। তাহলে কি আমরাও সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো? আমি আপনি ছাড়তেই পারবো না। আমরা আমাদের মনের যে অবস্থায় আছি এই অবস্থায় কখনই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারবো না। তাহলে আমাদের কি হবে? আত্মজ্ঞান হবে না। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কাছে একজন দীক্ষা নেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করছেন 'মহারাজ, যদি একশ আটবার জপ না করতে পারি তাহলে কি হবে'? মহারাজ বলছেন 'যেটা হবার ছিল সেটা হবে না'। আমরা মনে করছি যে ঠাকুর নিজে কোমরের ধুতি সামলাতে পারতেন না তিনি কি করে আমাকে সামলাবেন, তাহলে কি হবে? আত্মজ্ঞানও ওই রকমই হবে। যতটা ওইদিকে কম ততটা এই দিকেও কম পড়বে। আর যদি পুরোটাই ছেড়ে দিই, হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি তো তোমার কোমরের ধুতি সামলাতে পারতে না, আমি জানি আমাকেও তুমি সামলাতে পারবে না, তোমার ধুতির মত আমারও একই অবস্থা, তাও তোমাকে আমি ছাড়ছি না। তখন দেখবো আমি আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে চলেছি।

মনে রাখতে হবে আচার্য এখানে সন্ন্যাসের কোন কথা বলছেন না, শুধু বলছেন *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য*। তাহলে গীতার উদ্দেশ্য কি? সমগ্র গীতার মূল বক্তব্য হল – *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। ঠাকুর বলছেন গীতার সার হল দশবার গীতা উচ্চারণ করলে যা হয়। গীতা গীতা বলতে বলতে তাগী তাগী হয়ে যায়। তাগী মানে ত্যাগ, ত্যাগ মানে সন্ন্যাস। এই কথাই আচার্য এখানে বলছেন গীতার বক্তব্য সন্ন্যাস, সব কিছু ত্যাগ কর। ঠাকুরও বলছেন সম্পূর্ণ ত্যাগ। অবতাররা কখন দুই রকমের কথা বলবেন না। সীমিত বুদ্ধি বলে আমরা আমাদের মত বুঝি। যখন ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছেন সংসারে থেকে কি হবে না, তখন ঠাকুর বলছেন কেন হবে না। এখানে একটা জিনিষ ভালো করে মাথায় রাখতে হবে, সংসারে থেকে সংসারীর ভাব যদি থাকে তাহলে কোন দিন হবে না। যদি সংসারীর ভাব না থাকে তখন আমি বেলুড় মঠেই থাকি, কিংবা আমি বাড়িতেই থাকি বা হিমালয়ের কোন গুহায় আছি তাতে কোন কিছুই আসে যায় না। যদি হওয়ার থাকে তাহলে আমি যেখানেই থাকি না কেন সেখানেই হবে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টাতে হবে। হিমালয়ে থেকেও আমার সংসারের ভাব থাকতে পারে আবার সংসারে থেকেও আমার সন্ন্যাসের ভাব থাকতে পারে। মন থেকে পূর্ণ সন্ন্যাস থাকতে হবে।

অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো বর্ণান্ আশ্রমাংশ্চ উদ্দিশ্য বিহিতঃ স দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি

ফলাভিসন্ধিবর্জিতঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে। তথা চেমমেবার্থমভিশঙ্কায় বক্ষ্যতি – 'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি' (গীতা-৫/১০) 'যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাঽঽত্মশুদ্ধয়ে (গীতা-৫/১১) ইতি।

যার ভেতর থেকে সংসারের ভাব যাচ্ছে না, সে বলছে ভাই আমার দ্বারা সব কিছু ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাদের জন্য আচার্য বলছেন *অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ* অভ্যুদয় মানে জাগতিক স্বাচ্ছল্যতা, *যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো*, জগতের এই অভ্যুদয় প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দিয়ে হয়। যদি কাজ না করা হয় তাহলে অর্থ আসবে না, অর্থ না এলে ভালো খাওয়া-দাওয়া জুটবে না, ভালো জামা-কাপড় পড়তে পারবে না। যদি কাজ করতে থাকে তাহলে সব দিকে স্বচ্ছলতা এসে যাবে। সেইজন্য বলছেন প্রবৃত্তিলক্ষণ সব সময় অভ্যুদয়ের দিকে নিয়ে যায়। অভ্যুদয়ের ফল সব সময় সাংসারিক উন্নতি। এই সংসারে যদি দেখা যায় কেউ ভালো বাড়িতে থাকে, দামী গাড়িতে চাপছে, বাড়িতে এসি আছে, দামী পোশাক পড়ে তাহলে বুঝতে হবে সে কাজ করছে, সে হয়তো ধাপ্পাবাজ হতে পারে, চোর হতে পারে, কিন্তু তাকেও কিছু করতে হচ্ছে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম সব সময় বর্ণ আর আশ্রমকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা সব কিছুর বাইরে আর যাঁরা সন্ন্যাসী নন তাঁদের সবাইকে বর্ণ ও আশ্রমের নিয়ম পালন করে চলতে হত। তখনকার দিনে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলতে সাধারণত সাংসারিক কাজকর্ম আর বিশেষ করে যজ্ঞ-যাগকে বোঝাত। এই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সাংসারিক অভ্যুদয় মানে ভালো থাকা-খাওয়া-পড়া আর তার সাথে *দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুঃ*, তুমি যদি যজ্ঞ-যাগ কর তাহলে স্বর্গে যাবে, স্বর্গে দেবতা হয়ে জন্মাবে, তার বেশী কিছু হবে না। গীতাতেই বলবে *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, যজ্ঞ করে যে পুণ্যফল জমেছিল সেগুলো ক্ষয় হলে আবার স্বর্গ থেকে নেমে আসতে হবে। আবার এখানে এসে কাজ করতে থাকবে, আবার স্বর্গে যাবে, আবার আসবে, এই যাওয়া-আসা চলতেই থাকবে। যা কিছু কর্ম করবে তার একটা ফল হবে, আর সেই ফলের একটা অন্ত হবে। এই কর্মই সবাইকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে ফেলে রেখেছে।

এই কর্ম-চক্র থেকে বেরোবার উপায় তাহলে কি? আচার্য বলছেন *ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানঃ সত্যশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জিতঃ*। এই যে কর্ম করা হচ্ছে, এই কর্মকেই যদি ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি দিয়ে করা হয়, অর্থাৎ যদি কেউ বলে আমি যা কিছু কর্ম করছি এর কোন ফল আমার লাগবে না, আমি সব ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিলাম। তখন এই কর্মই মানুষের আত্মশুদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আচার্য এখানে যে শব্দটা ব্যবহার করছেন তাহল *সত্ত্বশুদ্ধয়ে*, সত্ত্ব মানে বুদ্ধি, যখন ফলাকাঙ্খারহিত হয়ে কর্ম করা হয় তখন সেই কর্মই বুদ্ধির শুদ্ধির কারণ হয়ে যায়। গীতায় তাই নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা এতই দুর্ভাগা যে কর্ম করার আগেই ফলের চিন্তা করি। ভগবান গীতায় বলছেন কর্ম কর ফলের চিন্তা করবে না, এটা হল শ্রেষ্ঠতম। তার থেকে একটা ধাপ নীচে হল কর্ম কর ফলও নাও। কিন্তু আমাদের অবস্থা হল কর্ম না করেই সবাই ফল চাইছি।

এটাই আসুরিক প্রবৃত্তি। মানুষ যখনই কোন কর্ম করে তখন সেই কর্মে তার একটা ফলের আশা থাকে। সেই ফল কি রকম হয়; বলছেন একটা হল জগতের অভ্যুদয় হয় আর দ্বিতীয় মৃত্যুর পর স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদির শরীর পাওয়া। কিন্তু সেই কর্মকেই যদি কেউ নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বার্পণ বুদ্ধিতে করতে চায় তখন তার দুটি পথ আছে। একটা হল সম্পূর্ণ নিষ্কাম আর দ্বিতীয় পথ হল মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরে কর্মটা অর্পণ করে দাও। আমরা বলি ঠিকই কিন্তু ধরে রাখা খুব মুশকিল। ঠাকুর বলছেন অশ্বত্থ গাছ আজকে কেটে দিলে কাল আবার ফেকড়ি বেরিয়ে যাবে। কোথা থেকে যে বাসনা ভেতরে ঢুকে পড়ে বোঝা খুব মুশকিল। আর ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হয়ে যায় ততক্ষণ হয় না। কিন্তু তাই বলে ছেড়ে দিলে হবে না, রোজ সকাল বিকেল ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে টিয়া পাখির মত বলে যেতে হবে ঠাকুর সব ফল তোমায় দিলাম। এইভাবে বলতে বলতে একদিন মনে হবে তাই তো আমি রোজ কি বলছি, তখন আমাদের মধ্যে ভাবের পরিবর্তন আসবে।

ফলাকাঙ্খা বর্জিত হয়ে কর্ম করা আর ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কাজ করা, এই দুটি ভাব যদি থাকে তাহলে যে ধর্ম আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে সেই ধর্মই আমাকে মুক্তি দিয়ে দেবে, এটা কিন্তু আচার্য বলছেন। আচার্যের কথা মানে এর পরে আর কোন কথা চলে না। তার মানে, যাঁরা গৃহস্থ ধর্ম পালন করছেন, যাঁরা পূজা অর্চনাদি করছেন, যাঁরা যজ্ঞাদি করছেন এঁরাও কিন্তু মুক্তি পেতে পারেন। তবে দুটি শর্ত থাকতে হবে, এক পুরো নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে হবে, আচার্যের ভাষায় *ফলাভিসন্ধিবর্জিত*, কোন ফলের আকঙ্খা থাকবে না, আর দ্বিতীয় ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কাজ করা। পুরো নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা কি সম্ভব; একেবারেই সম্ভব নয়। মুখে বলা যেতে পারে কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তাঁর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। কর্মের উপর এমন একটি শর্ত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যা কখন পালন করা সম্ভব নয়। ঠাকুর বলছেন কর্ম করলেই অহঙ্কার এসে পড়ে, লোকমান্যির ইচ্ছে জেগে যায়। কিছুই করার থাকে না, অহঙ্কার আসবেই। তবে দ্বিতীয় শর্ত যেটা বলছেন, *ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা*, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সে বলে আমি যা কিছু কর্ম করলাম তার ফল সব প্রভুকে সমর্পিত করে দিলাম। প্রভুকে কর্মের ফল সমর্পণ করতে করতে একটা সময় ভেতরে পবিত্রতা আসতে শুরু হয়। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তার অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার চেষ্টা করেন, যদিও খুব কঠিন। সেইজন্য বলা হয় ভক্তি পথ সহজ পথ। আমি দেখতে পাচ্ছি ঠাকুরের মন্দির আছে, মন্দিরে সকালে গিয়ে ঠাকুরকে বললাম, হে ঠাকুর! আজ সারাদিন যা কাজ করব তার ফল যেন তোমার চরণে সমর্পণ করতে পারি। সন্ধ্যেবেলা আবার মন্দিরে গিয়ে বললাম, হে ঠাকুর! সারাদিন যা কাজ করলাম তার ফল তোমাকে সমর্পণ করে দিলাম। যদিও মুখের কথা, যদিও যন্ত্রের মত বলে যাচ্ছি কিন্তু এইভাবে বলতে বলতে একটা সময়ের পর থেকে আমার ব্যক্তিত্বে, কর্মের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন হতে শুরু হয়। তারপর যদি কোন বিপর্যয় আসে তখন আমি আর আগের মত ভেঙে পড়বো না, নিষ্কাম কর্ম মানেই তাই। আর ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যদি চলে তখন মনে করবে এই বাড়িটা কার; ঈশ্বরের বাড়ি। বাড়িটা ভেঙে গেল, ঠাকুরের বাড়ি ভেঙে গেছে আমার কি

আর করার আছে। পাড়ার কারোর বাড়ি ভেঙে গেলে কি আমার মন খারাপ হয়; কখনই হয় না। খুব হলে যার বাড়ি তাকে দুটো সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়ে দিলাম। এগুলো মুখে বলা খুবই সহজ কিন্তু একদিনে হয় না। ঈশ্বারার্পণ বুদ্ধিকে অনেকদিন ধরে ঘষতে ঘষতে তবে গিয়ে হয়, সাধনা মানেই তাই।

কাজ করলে কি হয়; মন শুদ্ধ হয়। স্বামীজী বলছেন This world is a great gymnasium, where we come to build up ourselves, এই জগৎটা হল একটা জিম, এখানে কাজ করতে করতে আমাদের মন বুদ্ধি পরিষ্কার হয়। জগৎটা হল কুকুরের লেজ, কুকুরের লেজকে কখনই সোজা করা যাবে না। তাই বলে কি আমরা লেজকে সোজা করার চেষ্টা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকবো; অবশ্যই সোজা করার চেষ্টা করে যেতে হবে। ওই লেজ সোজা করতে গিয়ে আমরাই সোজা হয়ে যাবো। লেজ সোজা করাটা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য নিজেকে সোজা করা। কর্ম করলে মনের শক্তি বৃদ্ধি হয় আর তার সাথে ধর্মীয় আচরণ করলে মনের পবিত্রতা বৃদ্ধি হবে। কাজ করা মানেই মনের শক্তি বৃদ্ধি হওয়া, অসুররাও তাই কাজ করে। পায়ের ব্যায়াম করলে পায়ের শক্তি বাড়বে, হাতের ব্যায়াম করলে হাতের শক্তি বাড়বে, মনের ব্যায়াম করলে মনের শক্তি বাড়বে। সাধারণ ভাবে কাজ করলে ওই কাজ আমাদের অসুর বানিয়ে দেবে। কিন্তু যদি ধর্মপ্রাণ হয়, ধর্ম ভাব নিয়ে যখন যে কাজই করা হবে তখন ওই কাজ আমাদের শুদ্ধ পবিত্র করে দেবে। শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলে তখন সে *জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ*, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা অর্জন করবে। প্রাণান্তক কাজ আর প্রাণান্তক ধর্মাচরণ করলেই এই শুদ্ধতা ও পবিত্রতা অর্জন করা যায়, এটাই জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতা প্রাপ্তির দ্বার। শুধু দৈনন্দীন কাজ যেগুলো দিনগত পাপক্ষয়ের জন্য করা হয় সেই কাজ দিয়ে কখনই এই শুদ্ধতা অর্জন করা যায় না।

যখন আত্মজ্ঞান নিষ্ঠার যোগ্যতা অর্জন হয়ে গেল তখন ধর্ম কথা শাস্ত্র কথা শুনলে সেটাই *জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন*, জ্ঞান উৎপত্তির কারণ হয়ে যায়। প্রথমে প্রচুর কর্ম ও ধর্মাচরণ করে মনকে শুদ্ধ করা হল, শুদ্ধ করার পর জ্ঞান ধারণা করার একটা প্রস্তুতি নিল, তখন এটাই জ্ঞান উৎপত্তির কারণ হবে। একটা জমিতে আমি চাষ করতে চাইছি। প্রথমে আমাকে জমির আগাছা গুলো কেটে পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করার পর কোদাল চালিয়ে জমিটাকে সমান করতে হবে। তারপর আবার হয়তো কিছু আগাছা জন্মাবে, সেগুলোকে আবার উপড়ে ফেলতে হবে। এইভাবে জমির মাটিটাকে তৈরী করা হল। মাটি তৈরী হওয়ার পর বীজ দিলে তবেই সেখান ফসল হবে। আর জমি তৈরী না করে প্রথমেই যদি মাটিতে বীজ দিয়ে দেওয়া হয়, ওই আগাছাগুলোই বীজগুলোকে নষ্ট করে দেবে। আমাদের মধ্যে জ্ঞানোৎপন্ন হচ্ছে না, কারণ আমরা যেটা করার সেটা করছি না। কি করছি না; প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম করছি না। যে বুকফাটা কাজ করার দরকার সেটা করা হচ্ছে না, তাই মন আগাছাতে ভরে আছে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম যতক্ষণ না করা হয় ততক্ষণ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কোন ভাবেই হবে না। যতক্ষণ সগুণ সাধনা না করা হয় ততক্ষণ নির্গুণ সাধনা হয় না।

হাওড়া থেকে ট্রেনে আমি দিল্লী যাচ্ছি, আমি জানি ট্রেন বর্ধমান, আসানসোল, গয়া, মোগলসরাই হয়ে দিল্লী যাবে। সবাইকে ট্রেনে দিল্লী যেতে হলে এভাবেই যেতে হবে। আমাদের মাথায় ঢুকে আছে যে, যারাই মুক্তির পথ নিয়েছে সবাইকে এক ভাবেই যেতে হবে। কিন্তু সবার মুক্তির পথ এক নয়, সবারই পথ আলাদা আলাদা। কেউ হয়তো দুম্ করে এগিয়ে চলে গেল, সেখানে পৌঁছে যেগুলো বাকি ছিল সেগুলো চটপট করে নিল, করে নিয়ে আবার ওখান থেকে এগিয়ে যেতে থাকল। আমার বন্ধু রোজ ভোর চারটের সময় উঠে খুব জপ-ধ্যান করে। বন্ধুকে দেখে আমারও উৎসাহ হল আমিও ভোর চারটের সময় উঠে জপ-ধ্যান করবো। কিন্তু দুই একদিন করেই আমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। কারণ আমার সেই সাধনাটা করা নেই যেটা আমার বন্ধু অনেক আগেই করে রেখেছে। আবার আমার বন্ধুর এমন কিছু দুর্বলতা আছে যেগুলো আমার মধ্যে নেই। ওই দুর্বলতার জন্য আমার বন্ধুকে হয়তো একটা জায়গায় আটকে থাকতে হবে, আর আমি হয়তো সেই দুর্বলতা না থাকার জন্য এগিয়ে যেতে থাকব। কথামৃতে ঠাকুর তাই বলছেন – অনেকে মনে করে আমি সাধন পথে অনেক এগিয়ে গেছি কিন্তু হারা-জেতা তাঁর হাতে।

প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম করে করে মন একেবারে শুদ্ধসত্ত্ব হয়েছে, মন একেবারে পরিষ্কার আর শক্তিশালী হয়ে গেছে, এবারে সে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন সে যেই উপযুক্ত গুরুর হাতে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান হয়ে যাবে। ঠাকুর নরেনকে ছুঁয়ে দিতেই নরেন সমাধিতে চলে গেল। ঠাকুরতো আরও অনেককে ছুঁয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু নরেন ছাড়া আর কারোর তো সমাধি হয়নি। এই কারণেই হয়নি, নরেন তৈরী হয়েই ছিল। আপনি যদি বলেন – আঃ, আজকে কি দারুণ তেঁতুলের আচার খেলাম, তেঁতুল নেই কিন্তু আপনার মুখে তেঁতুলের কথা শুনেই আমার মুখে জল আসতে শুরু করে দিল। জলটা কোথা থেকে আসছে, তেঁতুল থেকে না কি মাথা থেকে, মাথা থেকে। তেঁতুলের স্বাদ আমার জানা, তেঁতুলের ব্যাপারে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে বলেই মুখে জল আসছে। ঠিক সেই রকম, আমার আগে থাকতেই যদি প্রস্তুতি থাকে তখন অবতার শুধু একটু তাকাবেন আর ওই দৃষ্টিপাতেই আমার জ্ঞানোৎপত্তি হয়ে যাবে। কথামৃতে ঠাকুর এটাকেই গল্পচ্ছলে বলছেন – একটা পোড়ো বাগান, সেখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা ফোয়ারা রয়েছে। ফোয়ারার মুখটা বন্ধ। একজন কুশল কারিগর এসেছে। কারিগর দেখেই বলছে, আরে, এটা তো একটা ফোয়ারা, কারিগর এটা সেটা নাড়ানাড়ি করতেই তুবড়ির মত জল বেরোতে শুরু করে দিল। তার মানে জলের উৎসের সাথে ফোয়ারার যোগ হয়েই আছে, শুধু একটা কিছু চাপা ছিল। অবতার পুরুষরা তাই একটু তাকালে বা ছুঁয়ে দিলে যেটুকু বাধা ছিল সেটুকু সরে গিয়ে জ্ঞানের ফোয়ারা খুলে যাবে। আমরা শুনে থাকি ঠাকুর দৃষ্টি মাত্রে, কিংবা সঙ্কল্প মাত্রে বা স্পর্শ মাত্রে কারো কারো মধ্যে চৈতন্য জাগ্রত করে দিতেন। তার মানে তাঁর মধ্যে সেই শক্তি ছিল। তেঁতুলের কথা ভাবলে মুখে জল আসে কিন্তু ভাতের কথা ভাবলে মুখে জল আসে না। ঠাকুর হলে পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার পুঞ্জিভূত রূপ। তাঁর ইচ্ছামাত্রেই তিনি যে কারোর ওই নার্ভ সেন্টারস্ গুলো অন্ করে দিতে পারতেন। কিন্তু যদি

প্রস্তুতি না থাকে, উৎসের সাথে যদি যোগ না থাকে তাহলে কি হবে, তাহলে যেমন কিছু লোক খোস গল্প করতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে চলে আসত, ওই রকমই হবে। ঠাকুর এই ধরণের লোক দেখলেই বুঝতে পারতেন, তাদের তিনি রাণী রাসমনীর বিল্ডিং দেখতে পাঠিয়ে দিতেন।

আচার্য বলছেন, এই উদ্দেশ্যকেই মাথায় রেখে গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন '*ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি*' আবার '*যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যাক্ত্বাহহত্মাশুদ্ধয়ে চ*' ইতি। যাঁরা যোগী তাঁরাও কর্ম করেন কিন্তু *সঙ্গং ত্যাক্ত্বা* মানে অনাসক্ত ভাবে কর্ম করেন। কেন অনাসক্ত ভাবে করেন, আত্মশুদ্ধির জন্য। আমরা সাধারণ মানুষ যে কাজ করছি সব হয় আমার স্ত্রীর জন্য, নয়তো সন্তানের জন্য, না হলে নামযশের জন্য। কিন্তু যখন যোগী হয়ে যাবো তখন বলব এবার আমি নিজের জন্য কাজ করছি। নিজের জন্য মানে আত্মশুদ্ধির জন্য। এরপর যোগী আর ভোগীর মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না। একই কাজ দুজনেই করে যাবে, রামকৃষ্ণ মিশনও স্কুল হাসপাতাল চালাচ্ছে আবার বড় বড় কোম্পানীগুলোও স্কুল হাসপাতাল চালাচ্ছে। কিন্তু তফাৎ কোথায়, অনাসক্ত আর আসক্তিতে।

একজন সন্ন্যাসী একবার স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে গিয়ে প্রশ্ন করছেন 'মহারাজ, আমি কাজকর্ম করে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু এই অনাসক্ত কর্ম, ঠাকুরের কাজ এগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না'। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তখন মঠের সেক্রেটারী। তখন শরৎ মহারাজ সেই মহারাজকে বোঝাচ্ছেন 'তুমি যেখানে কাজকর্ম করছ এই কাজগুলো কি তোমার নিজের কাজ', 'না মহারাজ'। 'তাহলে কি এগুলো তোমার বাবার কাজ, নাকি তোমার বাড়ির কাজ', 'না, তাও তো নয়'। 'এতটুকু তো বুঝেছ', 'হ্যাঁ মহারাজ'। 'তাহলে এখন কাজ করতে থাক, বাকিটা পরে পরিষ্কার হয়ে যাবে'। অনেকে বলতে পারেন মঠের মহারাজরা নিজেদের ব্যস্ত রাখার জন্য কাজ করেন। ঠিকই বলছেন, ব্যস্ত রাখার জন্যও কাজ করা হয় কিন্তু সেটাও স্বার্থপর কাজের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। যে কাজে আমি আর আমার এই ভাব থাকে না সেই কাজটাই ঠিক ঠিক অনাসক্ত কাজ। যে কাজে কোন কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ জড়িত থাকে না সেই কাজটাই অনাসক্ত। যাঁরা এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কি কেউ চাকরি পাবেন, যাঁরা চাকরি করছে তাদের চাকরিতে কি মাইনে বাড়বে, যাদের বিয়ে হয়নি তাদের কি বিয়ে হয়ে যাবে, এগুলোর কোনটাই হবে না, সুতরাং এই শাস্ত্র অধ্যয়নে কামিনী-কাঞ্চনের কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু ছুটির দিনে দুপুরের ঘুম নষ্ট করে, উল্টে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে কত দূর দূর থেকে এখানে ছুটে আসছেন। এতে কি লাভ হবে, না দুটো পয়সা পাবেন, না কোন জগতের সুখ ভোগ হবে বরঞ্চ বাড়তি খাটনি। এর মধ্যে কোথাও কামিনী-কাঞ্চন নাম-যশ জড়িয়ে নেই। এটাই নিষ্কাম কর্মের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই ভাবটাই যখন সব রকম কাজে কর্মে জড়িয়ে যাবে তখন বুঝবেন তার মন এবার প্রস্তুত হয়ে গেল। এই ভাবটাকেই গীতায় বলছেন '*ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি*' এবং '*যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যাক্ত্বাহহত্মাশুদ্ধয়ে*' এই দুটি শ্লোকে।

ইমংদ্বিপ্রকারং ধর্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং। পরমার্থতত্ত্বং বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতঃ অভিব্যঞ্জয়দ্বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেভিধেয়বদ্গীতাশাস্ত্রং যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ। অতঃ তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া।।

এরপর আচার্য বলছেন *ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্মং* গীতাতে দুই প্রকার ধর্মের কথা বলা হয়েছে। বেদ, উপনিষদেও এই দুটি ধর্মের কথা বলে। ঈশাবাস্যোপনিষদের প্রথম দুটি মন্ত্রে এই দুটো ধর্মকে দিয়েই শুরু করা হয়েছে। *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ* এই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র তিনিই আছেন, *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা* ত্যাগের দ্বারা একে ভোগ কর, মানে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। আর যদি না পারে, সবার পক্ষে তো আর সব কিছু ত্যাগ করা সম্ভব নয়, তাদের জন্য বলছেন *কুর্বন্নেবহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ* তুমি যদি ত্যাগ করতে না পার, তোমার যদি একশ বছর বেঁচে থেকে ভোগ করার ইচ্ছে থাকে তাহলে কর্ম করতে থাক। কিন্তু, *ন কর্ম লিপ্যতে নরে*, কর্মে লিপ্ত হয়ো না। কাজ কর, ভোগ কর, সবই কর কিন্তু কোন কিছুতে লিপ্ত হতে যেও না।

তাহলে গীতার বৈশিষ্ট্য কি? গীতার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল – দুই প্রকার ধর্ম প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ ধর্মের বর্ণনা করা। এই কারণে গীতার ধর্ম হল পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। মুণ্ডকোপনিষদে যেমন একমাত্র নিবৃত্তিমার্গ ধর্মের বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য আমাদের কোন উপনিষদই প্রবৃত্তিমার্গের বর্ণনা করে না। উপনিষদ ধরেই নিয়েছে তোমার বেদ অধ্যয়ন হয়ে গেছে, প্রচুর যজ্ঞ যাগ করা হয়ে গেছে, সব রকম ভোগ করে নিয়েছ। অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ ধর্মের যা কিছু করার করে নিয়ে তুমি আত্মজ্ঞান নিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হয়ে আচার্যের কাছে এসেছ। সেইজন্য উপনিষদ বিশেষ কয়েকজন অধিকারীর জন্য, গৃহস্থদের জন্য উপনিষদ নয়। কিন্তু গীতা যদিও মোক্ষ শাস্ত্র কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে একজন উচ্চতম শ্রেষ্ঠ মানুষ সবারই জন্য গীতা।

গীতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল পরমার্থতত্ত্ব - পরব্রহ্ম - বাসুদেবকে অভিব্যক্ত করা। গীতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, প্রথম ও দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে পরমপ্রাপ্তির বর্ণনা করা। এই কারণেই গীতাকে বলা হয় মোক্ষ শাস্ত্র। গীতা চাইছে আমাদের পরমপ্রাপ্তি হোক, নিঃশ্রেয়স, মানে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম বস্তুকে পাইয়ে দেওয়া। কিভাবে পাবে? আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে। আত্মজ্ঞান মানেই পরমার্থতত্ত্ব, পরমার্থতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম তিনিই বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ বা যিনি ব্রহ্ম তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ, এখানে কোন তফাৎ নেই। গীতা এই জিনিষটাকে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। কিভাবে তুলে ধরছে? প্রবৃত্তিলক্ষণ আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দিয়ে। তুমি যদি প্রবৃত্তিমার্গকে অবলম্বন কর তাহলে তোমাকে এই এই ভাবে যেতে হবে আর যদি তুমি নিবৃত্তিমার্গের মধ্য দিয়ে যেতে যাও তাহলে তোমাকে এই ভাবে যেতে হবে। নিবৃত্তিমার্গে সব কিছু ত্যাগ করে দেওয়ার পর যা থাকবে তাই আছে। তখন তুমি দেখবে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই। আর তোমার যদি ত্যাগের শক্তি না থাকে, তুমি যদি বল আমি বিষয়ী মানুষ, আমি গৃহস্থ, আমার সংসারে দায়ীত্ব আছে, ঠিক আছে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তুমি সংসারে থেকে

কাজকর্ম করতে থাক, কাজ করতে করতে তোমার মনটাকে শুদ্ধ পবিত্র কর। মনকে শুদ্ধ করে তোমার যাবতীয় যা কিছু আছে সব ঈশ্বরের উপর অর্পণ করে দাও কিংবা অনাসক্ত হয়ে সংসারে সব কাজ করে যাও, এতেই তোমার হবে। এটাই গীতার উদ্দেশ্য।

আচার্য খুব সুন্দর বলছেন *যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন*, যদি গীতার অর্থ কেউ বুঝে নিতে পারে, তাহলে তার কি হবে; *সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ* যাবতীয় যা পুরুষার্থ আছে সব পুরুষার্থের সিদ্ধি হবে। পুরুষার্থ চারটে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। যদি কেউ গীতার অর্থ বুঝে নেয়, তাহলে তার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সবেতেই সিদ্ধি প্রাপ্তি হবে। এখানে বুঝে নেওয়া মানে আচরণ করাও বলা হচ্ছে, আমি বলছি ওসব আমার জানা আছে কিন্তু জানা থাকলেই হবে না, সেই রকম আচরণটাও করতে হবে। তুমি বলছ ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য, কিন্তু আচরণ করার সময় বাকি সব সত্য আর ঈশ্বরই অনিত্য, এইভাবে তো হবে না। কিন্তু গীতার শাস্ত্র বুঝে নিয়ে সেই রকম আচরণও করছে তখন চাইলে তার মোক্ষ লাভও হবে, যদি স্বর্গ চায় সেটাও পাবে, ভালো মানুষ রূপে জগতে পরিচিত হবে, যশও পাবে আবার তার সাথে কেউ যদি টাকা-পয়সাও চায় সেটাও পাবে। যদি ভোগ করতে চায় তাও করতে পারবে। শুধু গীতাকে বুঝে নিয়ে জীবনে প্রয়োগ করলে এত কিছু হবে। তাই হল, অর্জুন গীতা বুঝেছে বুঝে যুদ্ধ করেছে তাই সাম্রাজ্যও পেয়েছেন, স্ত্রী, পুত্র, সম্মান, নাম-যশ সবই পেয়েছেন।

সেইজন্য *অতঃ তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া*, আচার্য বলছেন আমি যত্ন সহকারে চেষ্টা করছি যাতে সবার কাছে গীতার অর্থটা স্পষ্ট হয়। তার মানে আচার্যও আজ থেকে চোদ্দশ বছর আগে বুঝে গিয়েছিলেন গীতা আমাদের মত লোকের হাতে পড়বে, আর তিনিও আমাদের বোঝাতে পারবেন না। তাই বলছেন আমি চেষ্টা করছি বোঝাতে, আমি জানি না তোমরা বুঝতে পারবে কি পারবে না। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি গীতার অর্থ বুঝে নিতে পার তাহলে তোমার সমস্ত পুরুষার্থের সিদ্ধি হবে।

এই হল আচার্য শঙ্করের গীতার সম্বন্ধ ভাষ্য। এই সম্বন্ধ ভাষ্য আমাদের বার বার অধ্যয়ন করে করে মাথার মধ্যে একবার বসিয়ে নিতে পারলে শুধু গীতা শাস্ত্রই নয় হিন্দুধর্মের সামগ্রিক চিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।